مسائل مهمة

في التوحيد

তাওহীদের

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

باللغة البنغالية

তাওহীদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
(শিরক - কুফরী - মুনাফেকী)

অনুবাদ
মুহাম্মাদ শামাউন আলী

সম্পাদনা
শেখ মুহসীন আলী

ইসলামী দাওয়াত ও নির্দেশনা সহযোগী অফিস,শাফা
P.O.Box : 31717, Riyadh : 11418, Saudi Arabia
Phone : 4200620, 4222626, Fax : 4221906

ⓒ دار الورقات العلمية للنشر والتوزيع ، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

قسم العلمي بالدار

مسائل مهمة في التوحيد. / القسم العلمي بالدار، محمد شمعون علي.- الرياض، ١٤٢٥هـ

١١٢ ص، ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٣ - ٤ - ٩٥٤٩ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- التوحيد أ. على، محمد شمعون (مترجم) ب. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٣٢٧٢

رقم الإيداع: ١٤٢٥/٣٢٧٤

ردمك: ٣ - ٤ - ٩٥٤٩ - ٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল (সঃ) এর উপর। অতপর-

রাসূলদের প্রচারিত তাওহীদের প্রধান দু'টি দিক রয়েছে, এ দু'টি ছাড়া তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না। তাহলো আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করাকে অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ»۔ (النحل : ٣٦)

'আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে, তারা দাওয়াত দিত–তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং খোদাদ্রোহী শক্তি (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু) হতে বিরত থাকবে।' (নাহল ঃ ৩৬)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

«وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا»۔ (النساء : ٣٦)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না।" (নিসা ঃ ৩৬)

তাওহীদের প্রথম বিষয় আল্লাহ্র প্রতি ঈমান- এর বিষয়টি স্পষ্ট। ঈমান ব্যতিরেকে কোন আমলই কবুল হবে না। এ ব্যাপারে যথেষ্ট লেখা-লেখি হয়েছে। আমরাও ইতোপূর্বে সে সম্পর্কে এক আলোচনায় বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছি। এখন আমরা দ্বিতীয় বিষয়টির উপর আলোচনা করব। আমরা একে "তাওহীদের পরিপন্থী" অথবা "যা তাওহীদ পরিপূর্ণ হতে বাধাগ্রস্থ করে" বিষয় বলে অভিহিত করব।

তাওহীদের পরিপন্থী বলতে আমরা বুঝি যা তাওহীদের পরিসীমা হতে মানুষকে বের করে দেয় এবং এর ফলে কাউকে মুরতাদ বলে অভিহিত করা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে দুনিয়াতে মুরতাদের শাস্তি এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার বিধান বর্তায়। আর **তাওহীদের পূর্ণতায় বাধাগ্রস্থ করা হলো** যা একে পরিপূর্ণতা দেয় না বরং অপূর্ণ করে। এর জন্য পূর্ণ তাওহীদ বলা যায় না এর উপর ভিত্তি করে এর উপর বিধান প্রযোজ্য হয়। এ দু'য়ের যে কোনটি দ্বারা কেউ বিশেষিত হলে তার উপর এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইসলামী দন্ডবিধী প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়টিকে

আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমত ঃ যে কাজ তাওহীদের পরিপন্থী। যেমন কিছু কথাবার্তা, কাজকর্ম বা আকীদা বিশ্বাস।

দ্বিতীয়তঃ যে কাজ তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী, যেমন কতিপয় কথন ও কাজ ।

তৃতীয়ত ঃ যে কাজের দুটি দিক রয়েছে। অন্তরে বিশ্বাসের দিক থেকে তাওহীদের পরিপন্থী। আর কর্ম বা কথনের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী।

উপরুল্লেখিত বিভাজনকে সামনে রেখে আমরা আমাদের আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করব এবং কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা করব যেন তাওহীদের দ্বিতীয় বিষয়টি পাঠক-পাঠিকার নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠে। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমাদের আলোচনাকে কবুল করেন এবং এ থেকে ফায়েদা হাসিলের তাওফীক দান করেন। আমীন৷৷

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	7
শিরক	7
বিশ্বাসীদের উপর শিরকের বিপজ্জনকতা	7
শিরকের পরিচয়	11
শিরকের প্রকারভেদ	14
বড় শিরকের প্রকার ভেদ	18
ছোট শিরকের প্রকার ভেদ	51
দ্বিতীয় অধ্যায়	55
কতিপয় শিরকী আমল সম্পর্কে কথা	55
তৃতীয় অধ্যায়	83
কুফরী	83
বড় কুফরীর প্রকার ভেদ	86
ছোট কুফরীর প্রকারভেদ	93
চতুর্থ অধ্যায়	101
মুনাফিকী	101
মুনাফিকীর প্রকারভেদ	101

প্রথম অধ্যায়
শিরক

বিশ্বাসীদের উপর শিরকের বিপজ্জনকতা

শিরক ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ্ এবং এর মাধমে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

«اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ»۔ (لقمان : ١٣)

'নিশ্চয় শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম।'(লোকমান ঃ ১৬) নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ

"أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ ..."۔

'আমি তোমাদের কি সবচেয়ে বড় গুনাহের কথা বলব না? তা হলো আল্লাহ্র সাথে শরীক করা...।' এ কারণে যদি কেউ শিরক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে জাহান্নামে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

«اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ»۔ (البينة : ٦)

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে আহলে কিতাবের মধ্য থেকে এবং

মুশরিকরা তারা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে এরা সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি।" (বাইয়্যিনাহ ঃ ৬)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

«انَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰهُ النَّارُ»۔ (المائدة : ٧٢)

'নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেনা।' (মায়েদা ঃ ৭২) শিরক হচ্ছে আমল বিধ্বংসকারী। আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সঃ) কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

«لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ»۔ (الزمر : ٦٥)

"যদি আপনি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে শরীক করেন তাহলে আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।" (যুমার ঃ ৬৫) যদি রাসূল (সঃ) কে সম্বোধন করে এ ভাবে বলা হয়ে থাকে তাহলে তার চেয়ে অধস্তন লোকদের কি অবস্থা হতে পারে যারা এর সাথে জড়িত। যে এ ধরনের শিরকের সাথে জড়িত তার সম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়ে যায়, সে মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে না। সে যদি মুর্তাদ হয়ে মারা যায় তাহলে তার

সম্পদ বায়তুল মালে 'ফায়' হিসেবে জমা হবে এবং তার মুসলমান আত্মীয় ওয়ারিসরা কোন সম্পদ পাবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا"۔

"আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি মানুষদের সাথে লড়াই করি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। এটা যদি তারা করে তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদকে আমার নিকট হতে রক্ষা করল। তবে এর বৈধ কোন কারণ ব্যতীত।" এটা তখনই ঘটবে যখন সেটি হবে বড় শিরক বা শিরকে আকবর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ"۔

"মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের মিরাস পাবে না।"

শিরকে আসগার বা ছোট শিরক আমল বিনষ্ট করে দেয় যে আমলের সাথে এর সংমিশ্রণ ঘটে বা এর উপর ভিত্তি করে সংঘঠিত হয় এবং এর সম্পাদনকারী শাস্তি পাবার সমূহ আশংকা রয়েছে। সে মারা গেলে তার শাস্তির ব্যাপারে বিভিন্ন কথা রয়েছে। সে হয়ত আল্লাহর ইচ্ছাধীনে ক্ষমা পেতে পারে বা নাও পেতে পারে তাই

শাস্তি পাবে, অথবা সে অবশ্যই শাস্তি পাবে এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যদিও সে চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামী হবে না অথবা তাকে ক্ষমা করা হবে, মতান্তরে তাকে ক্ষমা করা হবে না।

সালফে সালেহীনরা শিরকে আকবারের দলীলকেই শিরকে আসগারের দলীল বলে গ্রহণ করছেন কেননা তা এর মাঝেই শামিল। কেননা এটা গুনাহের মাঝে সবচেয়ে বড়। আল্লাহ তায়ালা সব শিরকের ব্যাপারেই বলেছেন যে তা সব চেয়ে বড় যুলুম যেমনটি পূর্ব উল্লেখ করা হয়েছে, ছোট শিরকের মাঝে অপ্রকাশ্য ভাব রয়েছে যা বড় শিরকের নেই। এর প্রবেশপথ খুবই সুক্ষ্ম এবং তা বুঝা বা সনাক্ত করা খুবই কঠিন, পক্ষান্তরে শিরকে আকবর এর অর্থ প্রকাশ্য এবং অবস্থা স্পষ্ট। যাদের জ্ঞানের গভীরতা কম তাদের নিকট এর স্বরূপ ও বাহ্যিক রূপ অপ্রকাশিত থাকে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ"۔

"সবচেয়ে বেশী ভয় করছি তোমাদের উপর ছোট শিরককে।"

এতে যেহেতু অস্পষ্টতা রয়েছে, সেহেতু এটা সহজে বুঝা যায় না, একে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে মনের আয়নায়। এ ছাড়াও অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। যখন দেখা যায় মনের অজান্তেই মুখ দিয়ে তা (ছোট শিরকের কথা) বের হয়ে যাচ্ছে। এজন্যই শিরকের উভয় প্রকারই একজন বিশ্বাসীর জন্যই খুবই

বিপজ্জনক। তাই মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ»- (يوسف : ١٠٦)

'এদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, তারা শিরক করে।' (ইউসুফ ঃ ১০৬) (তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় হতে যেহেতু মুক্ত থাকতে হবে যেমনটি ইতপূর্বে আলোচনা করেছি এবং শিরকের ভয়াবহতা বিপজ্জনকতার কথা জানতে পেরেছি তাহলে শিরক কি? এ বিষয়ে এখন আলোচনা করব)

শিরকের পরিচয়

শিরকের দু'টি অর্থ ঃ

প্রথমত ঃ সাধারণ অর্থ, তা হল অন্যকে আল্লাহর সমান করা এমন বিষয় যা একমাত্র তারই বৈশিষ্ট। এখানে সমান বলতে আল্লার সমকক্ষতা বুঝান হয়েছে যদিও সে গুণাবলী অন্যের চেয়ে কম বা বেশী থাকে। এ অর্থের উপর ভিত্তি করে শিরক তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

এক ঃ শিরকুর রবুবিয়াহ

তা হল তাঁর কোন বৈশিষ্টের সাথে কাউকে সমান করা বা অন্য কারো দিকে তা সম্পৃক্ত করা, যেমন সৃষ্টি, রিজিক, জীবন মৃত্যু। একে প্রচলিত পরিভাষায় তামসীল (সাদৃশ্য) ও তাতীল রদ বাতিল করা বলা হয়।

দুই ঃ শিরকুল উলুহিয়্যাত

তা হল তার বৈশিষ্টের সাথে কাউকে সমতা করা। যেমন নামায, রোজা, জবাই, মানত ইত্যাদি। যখন শিরক বলা হয় তখন সাধারণতঃ এই শিরকেই বুঝান হয়ে থাকে।

তিন ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে শিরক ঃ

তা হল আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে এ দু'বিষয় সমতা করা। একে তাফসীলও বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ শিরকের আরেক অর্থ হল ঃ

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তার ইবাদত ও আনুগত্য করা। কুরআন সুন্নাহ এবং সালফে সালেহীনরা শিরকের কথা উল্লেখ করলে এ অর্থই বুঝিয়ে থাকেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তার ইবাদত করবে অথবা তার আনুগত্য করবে সে কুরআন হাদীসের ভাষায় মুশরিক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

«وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ»۔

(يونس : ١٨)

'আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব সত্ত্বার ইবাদত করে যারা তাদের কোন উপকার এবং কোন ক্ষতি করতে পারে না, তারা বলে এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।' (ইউনুস ঃ ১৮)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

«أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ»۔ (الشورى : ٢١)

'আর তাদের কি কোন শরীক রয়েছে যা তাদের জন্য জীবন বিধান রচনা করেছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি।' (শুরা ঃ ২১) সুতরাং যে কেউ আল্লাহর ইবাদতকে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করবে বা তাঁর সাথে সংযুক্ত করে কারো নিকট প্রার্থনা করবে সে হচ্ছে মুশরিক। তেমনি ভাবে যে ধারনা করবে, আল্লাহ ছাড়াও অন্য কারো জীবন বিধান রচনা করার অধিকার রয়েছে সে হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক কারী। তাই প্রকৃতপক্ষে যখন 'শিরক' শব্দটি উল্লেখ করা হবে তখন এতে ইবাদত ও আইন রচনার বিষয়টি শামিল হবে। যেমনটি আল্লাহ বলেন ঃ

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ»۔ (الذاريات : ٥٦)

'আমরা মানুষ এবং জীনকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।' (যারিয়াত ঃ ৫৬) তিনি আরো বলেন ঃ

«إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ»۔ (الفاتحة : ٤)

'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।' আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন ঃ

«وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ»۔ (المائدة : ٤٩)

'আপনার প্রতি যা অবতীর্ন করা হয়েছে তা দ্বারা আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন।' (মায়েদ ঃ ৪৯) তিনি আরো বলেন ঃ

«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ»۔ (الأنعام : ٥٧)

'বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।' (আনয়াম ঃ ৫৭) আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন ঃ

«أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ»۔ (الاعراف : ٥٤)

"নিশ্চয় তাঁরই জন্য সৃষ্টি এবং নির্দেশ দেওয়ার অধিকার, বরকতময় আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক।"

সুতরাং সৃষ্টি যার, জীবন বিধান রচনা করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। অতএব তিনিই তাঁর সৃষ্টির জন্য জীবন বিধান রচনা করেন, কেননা তিনিই তাদের প্রভু। আর অন্য কারো এ অধিকার নেই, কেননা সৃষ্টি যার নয় সেজন্য হুকুম দেওয়ার অধিকার তার নেই।

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক তিন প্রকার ঃ

প্রথমতঃ শিরকে আকবর বা বড় শিরক

দ্বিতীয়তঃ শিরকে আসগার বা ছোট শিরক

তৃতীয়তঃ শিরকে খফী বা লুকায়িত শিরক।

শিরকে আকবর হলো ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ করে তার ইবাদত করা, তার আনুগত্য করা। এটা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে শিরক।

শিরকে আসগার বা ছোট শিরকঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে সমতা করা কোন কাজের ক্ষেত্রে। কাজের ক্ষেত্রে শিরক হলোঃ রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কথায় শিরক হচ্ছে এমন বাক্য বলা যাতে আল্লাহ এবং অন্যদের মাঝে সমতা হয়ে যায়। যেমন কেউ বলে 'আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান।' এবং 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর যদি তুমি চাও' এবং 'আব্দুল হারেস' ইত্যাদি বলা।

অপ্রকাশ্য বা গোপনীয় শিরক হচ্ছেঃ যা মনের গহীনে তার প্রকৃতি লুকায়িত থাকে। কথায় আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মাঝে সমতা করা হয়ে থাকে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ تَهْوِى بِهِ فِيْ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا".

'মানুষ এমন কথা বলে যে তার দ্বারা জাহান্নামের দিকে সে সত্তর বছরের পথ এগিয়ে যায়।' তিনি আরো বলেনঃ

"أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الاَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ؟ قَالَ اَلرِّيَاءُ".

"আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় করছি শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। তখন তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ রিয়া।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ইব্রাহিমের আঃ এর সংবাদ

জানিয়ে বলেন ঃ

«وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ »- (ابراهيم :٣٥)

'আমাকে এবং আমার সন্তানদের রক্ষা করুন মুর্তিপুজা হতে।' (ইবরাহীম ঃ ৩৫)

অপ্রকাশ্য শিরককে আমরা শিরকে আসগারের একটি প্রকার হিসাবে ধরতে পারি, তাহলে শিরক হবে দুই প্রকার। শিরকে আকবর তাহল অন্তরে বিশ্বাসের বিষয়ে এবং শিরকে আসগার হলো কর্মে, কথায় এবং গোপন ইচ্ছার বিষয়ে।

বিজ্ঞজনরা শিরককে যে তিন প্রকারে বিভাজন করেছেন এবং শিরকে খফী বা অপ্রকাশ্য শিরককে একটি প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন. তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শিরকে খফী কখনো শিরকে আকবর হতে পারে আবার কখনো শিরকে আসগার হতে পারে। এজন্যই এ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে কেননা এতে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। যার ফলে সেটাকে হয়তো মনে করবে তা শিরকে আসগর কিন্তু উল্টোটিই সঠিক। এর ফলে এর সংজ্ঞা হতে পারে, যা ছোট শিরক বা বড় শিরক হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে তাই শিরকে খফী। আর এটিই হচ্ছে আমার নিকট রাজেহ সংজ্ঞা । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ ' তা হল কাল পিপড়ার দলের কালো পাথরের উপর দিয়ে চলার চেয়েও অপ্রকাশ্য।' কেননা এ বিষয়টি খুবই সূক্ষ এবং একে জানতে বা চিনতে পারা বড়ই দুস্কর। সুতরাং এর ব্যাপারটি একমাত্র বিদগ্ধ

জ্ঞানীজন ছাড়া অন্য কেউ চিনতে পারে না। কুরআন ও হাদীসে যাদের গভীর বুঝ নেই তাদের পক্ষে একে চেনা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

পর্যালোচনার মাধ্যমে শিরকে আকবর ও শিরকে আসগরের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা এটিকে সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে তুলে ধরতে পারিঃ

একঃ শিরকে আকবর বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কিন্তু শিরকে আসগরে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে না।

দুইঃ শিরকে আকবর সমস্ত আমলকে বিনষ্ট করে দেয় কিন্তু শিরকে আসগর সে আমলকে বিনষ্ট করবে যা এর সাথে সংযুক্ত হবে বা এর সাথে জড়িত থাকবে।

তিনঃ শিরকে আকবারে চিরস্থায়ী জাহান্নাম লাভ ঘটবে কিন্তু শিরকে আসগরে চিরস্থায়ী জহান্নাম লাভ ঘটবে না। এতে হয় জাহান্নামী হবে বা আল্লাহর ইচ্ছাধীন হবে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন বা শাস্তি দিবেন।

চারঃ শিরকে আকবরে মানুষের জীবন ও সম্পদকে বৈধ করে দেয় (হত্যা করতে ও গনীমত করতে) কিন্তু শিরকে আসগর সম্পাদন কারী মুসলিম। মুমিন অপূর্নাঙ্গ ঈমানদার ধর্মীয় বিধানের দিক হতে ফাসিক।

পাঁচঃ দুই শিরক কারী ব্যক্তিরা শাস্তির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি এবং এদুটিই কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।

ছয়ঃ শিরকে আকবর কারীকে (পরকালে) ক্ষমা করা হবেনা শিরকে আসগরের বিপরীত। কেননা তাকে ক্ষমা করা হবে।

বড় শিরকের প্রকার ভেদ

বড় শিরকের প্রকার ভেদ হচ্ছে ছয়টি। তাহলঃ

একঃ শিরকুত দাওয়া বা দু'আয় শিরক

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইবাদত। যদি উদ্দেশ্য হয় দু'আর মাধ্যমে কোন কল্যাণ লাভ বা বিপদ দূর করা তাহলে তাকে বলা হবে দু'আয়ে মাস'আলা। আর যদি উদ্দেশ্য হয় বিনয়তা, দ্বীনতা ও অনুগত হওয়া তাহলে বলা হবে দু'আয়ে ইবাদত। দু'আয়ে মাসআলাহ বা দু'আয়ে ইবাদত কোনটিই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা হচ্ছে শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

«وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ»۔ (المؤمن : ٦٠)

'তোমাদের প্রভু বলেন তোমরা আমাকে ডাক তাহলে আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত হতে অহংকারবশত ফিরে যায় তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুমিন ঃ ৬০)

এখানে ইবাদত করা বলতে দু'আ করা বুঝান হয়েছে। আয়াতের প্রথমাংশ "তেমাদের প্রভু বলেন তোমরা আমাকে ডাক" বাক্যেই এর প্রমাণ। অতপর যারা অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করবে তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা পরিত্যাগ করবে মিথ্যা মনে করে বিরুদ্ধবাদী হয়ে যদিও অন্য কাউকে না ডাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

«ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً»۔ (الاعراف : ٥٥)

'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় ও ভীতির সাথে ডাক।' (আরাফ ঃ ৫৫) তিনি মানুষকে তাঁকে ডাকতে, তাঁর নিকট দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি বান্দা তাঁর এ নির্দেশ পালন করে তাহলে আবেদ বা আল্লাহর ইবাদত কারী। কেননা আল্লাহর নির্দেশ পালন ও বিধিনিষেধ মেনে নেওয়ার নামই ইবাদত। যদি এ নির্দেশ অমান্য করে এবং অন্য কাউকে ডাকে তাহলে সে ঐ জিনিসের ইবাদত করল। কেননা সে তাকে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সমতুল্য করল এবং তাঁর ইবাদতকে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করল। আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলেন ঃ

«تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ»۔ (الشعراء : ٩٧–٩٨)

'আল্লাহর শপথ! আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট বিভ্রান্তির মাঝে ছিলাম। কেননা তোমাকে আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমপর্যায়ে নিয়েছিলাম।' (শুয়ারা ঃ ৯৭-৯৮)

অতএব যা কিছুই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে আল্লাহর সমক্ষতায় নিয়ে যায় তা ইবাদত হোক বা আনুগত্য তা'ই আল্লাহর সাথে শিরক আর এটা বড় শিরক। সুতরাং দুই প্রকার দু'আই আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্গত। কুরআন শরীফে দু'আর অর্থ 'প্রার্থনা করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

«وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».- (المؤمن : ٦٠)

'আর আপনার প্রভু বলেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (মুমিন ঃ ৬০) সুতরাং কোন সৃষ্টি বা মৃত ব্যক্তির নিকট অথবা কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু চাওয়া বা প্রয়োজন পূরা করা অথবা বিপদ দুর করার যাঞ্চা করা জায়েয নয়। কেননা এসব মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। দু'আ বলতে এখানে কোন কিছুর প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া বা বিপদাপদ দূর করা বা কাংখিত বস্তু চাওয়া সবই বুঝায়।

দোয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো উদ্দেশ্যে হলে তা হবে শিরক। এর তিনটি শর্ত রয়েছে,

একঃ আহবান বা ডাক হবে প্রকৃত পক্ষে, লৌকিকতা নয়।

দুইঃ এমন বিষয়ে যা একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ।

তিনঃ প্রার্থনাকারী হতে অনুপস্থিত হবে। অনুপস্থিতি হতে পারে স্থানের ক্ষেত্রে অথবা সময়ের ক্ষেত্রে বা যার কাছে দু'আ সে মৃত।

এ অবস্থায় দু'আ করলে কোন উপকার করতে পারে না। কেননা অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তি দু'আ কারীর ও কাংখিত বিষয় কোন কিছুই জানতে পারে না।

কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল প্রমাণ এসেছে যে দু'আ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। যার কোন শরীক নেই। যেমন হযরত ইবরাহীম আঃ এর ঘটনা বর্ণনা করে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

«وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسى أَلاَّ أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ـ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ»ـ(مريم : ٤٨-٤٩)

অর্থাৎ- "আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালন কর্তার ইবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হবো না। অতপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন। (মরিয়ম ঃ ৪৮-৪৯)

মহান প্রভু আরো বলেন ঃ

«وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ

غَـافِلُوْنَ ـ وَاِذَا حُـشِـرَ النَّـاسُ كَـانُـوْا لَهُـمْ اَعْـدَاءً وَّكَانُـوْا بِـعِبَادَتِـهِمْ كَافِرِيْـنَ » ـ (الأحقاف : ٥-٦)

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবেনা, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারাতো তাদের পূজা সম্পর্কেও বে খবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।" (আহকাফ ঃ ৫-৬)

মহান প্রভু মানুষের সংকটকালিন অবস্থার উল্লেখ করেছেন প্রমাণ হিসাবে যে, বিপদের সময় তারা সবকিছু বাদ দিয়ে একান্তভাবে আল্লাহকে ডাকে। তাদের প্রকৃতির দিকেই ফিরে যায় তারা একথা বিশ্বাস করে যে, সব বাদ দিয়ে একমাত্র মহান আল্লাহকেই ডাকা জরুরী। তিনি বলেনঃ

« وَاِذَا غَشِيَـهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْـنَ »ـ (لقمان : ٣٢)

'যখন তাদেরকে (নদী-সমুদ্রে) মেঘমালা সদৃশ ঢেউ ঢাকিয়া ফেলে তখন তারা খাঁটি মনে দ্বীনের অনুগত হয়ে আল্লাহকে ডাকতে থাকে।' (লোকমাণ ঃ ৩২) এ আয়াত থেকে প্রমানীত হয় যে, দু'আ দ্বীনের অন্তর্গত। আর দ্বীন হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

«وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ»۔ (الانفال : ٣٩)

অর্থাৎ - "দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" (আনফাল ৩৯)

অন্যত্র আল্লাহর বাণী ঃ

«فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجَاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ»۔ (العنكبوت : ٦٥)

অর্থাৎ - "তারা যখন জলযানে আরোহন করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতে থাকে"। (আনকাবুতঃ ৬৫)

তিনি আরো বলেন ঃ

«رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا»۔ (بنى اسرائيل : ٦٦)

'নদী সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে তখন সেই এক খোদা ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থল ভাগে

পৌঁছায়ে দেন তখন তোমরা তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে লও।' (বনী ইসরাঈল ঃ ৬৬)

তিনি আরো বলেন ঃ

«هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ»۔ (يونس : ٢٢)

'এমন কি তোমরা যখন নৌকায় আরোহন করে অনুকুল হাওয়ায় আনন্দ স্ফুর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীত মুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারিদিক হতে তরংগের আঘাত এসে ধাক্কাদেয়, মুসাফির মনে করে যে তারা ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে তারই নিকট দু'আ করে।' (ইউনুস ঃ ২২)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

«فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُوْنَ »۔ (المؤمن : ١٤)

'সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তারই জন্য খাঁটি ভাবে নির্দিষ্ট করে।' (মুমিন ঃ ১৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

« هُوَ الْحَيُّ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ »۔ (المؤمن : ٦٥)

'তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তোমরা তাঁকেই ডাক নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দাও।' (মুমিন ঃ ৬৫)

এ প্রকার শিরক হল বড় শিরক, মুশরিকদের শিরক। অধিকাংশ লোকেরাই এতে জড়িত। মহান প্রভু বলেন ঃ

« قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلاً ـ اُولئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا »۔ (بنى اسرائيل : ٥٦-٥٧)

অর্থাৎ - 'তাদেরকে বলুন, সেই মাবুদদেরকে আহ্বান করে দেখ,

যাদেরকে তোমরা খোদা ছাড়া নিজেদের কর্মকর্তা মনে কর। তারা তোমাদের কোন কষ্ট লাঘব করতে পারে না, পারে না তা বদলাতে। এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের খোদার নিকট পোঁছার অসীলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তি হয় যাবে এবং তার আযাবকে ভয় করে। আসল কথা এই যে আপনার খোদার আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মতো।' (বনী ইসরাঈল ঃ ৫৬-৫৭)

এসব আয়াতে দু'আর সাথে ভয়ভীতি ও আশা-আকাংখা যুক্ত রয়েছে। প্রার্থনার ও ইবাদতের দু'আর মাঝে পার্থক্যের ব্যাপারে বলা যায় -

প্রথমঃ প্রার্থনার দোয়া হল যাতে উপকার চাওয়া হয় এবং বিপদাপদ দূর করতে বলা হয়- ইবাদতের দু'আ বিপরীত তাতে পূর্ণ অনুগত হতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রার্থনার দু'আ হল রবুবিয়াতের অর্ন্তগত আর ইবাদতের দু'আ হল উলুহিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ প্রার্থনার দু'আ মুমিনদের জন্যই শুধুমাত্র নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু ইবাদতের দু'আ মুমিনদের সাথে নির্দিষ্ট।

চতুর্থতঃ প্রার্থনার দু'আ রিজিক এর সাথে শামিল। কেননা সব সৃষ্টিরই নির্দিষ্ট করা আছে, তার রিজিক সময়কাল পাপী অথবা নেককার। কিন্তু ইবাদতের দু'আ এরূপ নয়।

পঞ্চমত ঃ প্রার্থনার দু'আ দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ইবাদতের দু'আ শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট।

ষষ্ঠতঃ মুমিনের মাঝে এ দু প্রকার দু'আ পাওয়া যায়। সে দু'আ করে কিছু পাবার জন্য অথবা তার ইবাদত হিসাবে।

সপ্তমঃ এ দু প্রকার দু'আ যখন কোন মুমিন বান্দার পক্ষ থেকে হয় তখন এতে ভয়ভীতি আশা-আকাংখা যুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

«وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا»۔ (الأنبياء : ٩٠)

'তারা আমাকে ডাকে ভয়ভীতি ও আশা-আকাংখা নিয়ে।' (আম্বিয়া ঃ ৯০) দু'আ উত্তম ইবাদত ও বিরাট আনুগত্যের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»۔ (البقرة : ١٨٦)

'আপনাকে যখন আমার কোন বান্দা প্রশ্ন করে আমার সম্পর্কে তাকে জানিয়ে দিন আমি তার অতি নিকটে। যখন কেউ আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই।' (বাকারা ঃ ১৮৬)

তিনি আরো বলেন ঃ

«وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِه»۔ (النساء : ٣٢)

"তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।" (নিসা ঃ ৩২)

অন্যত্র বলেন ঃ

«وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ»۔ (المؤمن ٦٠)

'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (মুমিন ঃ ৬০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ".

"দু'আ-ই হল ইবাদত।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُّسْأَلَ".

'তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন যে তাঁর নিকট যেন প্রার্থনা করা হয়।' অন্যত্র নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ

"إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِى الدُّعَاءِ".

"আল্লাহ তা'য়ালা যারা দুআতে কাকুতি-মিনতি কারীকে পছন্দ করেন।"

এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট দু'আ করে প্রার্থনা করে, সে হল মুশরিক। মহান প্রভু বলেন ঃ

«وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَابُرْهَانَ لَهُ بِهِ

فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط اِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكفِرُوْنَ »۔

(المؤمنون : ١١٧)

“যে কেউ আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে যার সমর্থনে তার নিকট কোন দলীল নাই তার হিসেব আল্লাহর নিকট রয়েছে। এ ধরনের কাফেররা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।” (মুমিনুন ঃ ১১৭)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকল সে তাকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করল এবং তার ব্যাপারে কুফরের ফয়সালা দেয়া হল।

«ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَاكَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ج قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ »۔

(الزمر : ٨)

‘পরে তার আল্লাহ যখন তাকে আপন নে’আমত দানে ধন্য করুন, তখন যে সেই বিপদ ভুলে যায় যে জন্য সে পূর্বে খোদাকে ডেকেছিল এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে নেয়, যেন তার পথ হতে পথভ্রষ্ট করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বলুন যে, অল্প কিছু দিন আপন কুফরীর স্বাদ লাভ করতে থাক। নিশ্চয় তুমি দোযখগামী হবে।’ (যুমার ঃ ৮) মহান প্রভু আরও বলেন ঃ

«وَاِذَا مَسَّ الاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا اِلَيْهِ»۔ (الزمر : ٨)

'মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে। তখন সে নিজের আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে তাকে ডাকে।' (যুমার ঃ ৮) এ আয়াতে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে তাকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর প্রতিটিই হচ্ছে শির্ক বা আল্লাহর সাথে সমতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরী ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করা হয়েছে। মহান প্রভু অন্যত্র বলেনঃ

«وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ـ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ»۔ (فاطر : ١٣-١٤)

'তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা একটি তৃণখন্ডের মালিক নয়। তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের দু'আ শুনতে পায় না। শুনলেও তোমাদেরকে এর কোন জবাব দিতে পারে না।" (ফাতির ঃ ১৩-১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা হারাম এবং তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই একমাত্র সমস্ত কর্মকান্ডের মালিক। আর এ সব উপাস্যরা কোন ডাক শুনে না, জবাব দেয়া তো দুরের কথা। যদি ধরেও

নেওয়া হয় যে তারা শুনতে পাচ্ছে তথাপি তারা তাদের ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। কেননা তারা কোন উপকার বা অপকার করতে বা এ ধরনের কোন কিছু করতে সম্পূর্ণ অপারগ।

২য় প্রকার শিরক হল নিয়্যত বা ইরাদা সংক্রান্ত- ইচ্ছায় শিরক

তা হল কোন বান্দা নিয়্যত বা ইচ্ছা পোষণ করে, কোন কাজ করতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে। এটিই হল বিশ্বাসগত শির্ক। এ জাতীয় শিরক-এর দলীল হল আল্লাহ তা'আলার এ বাণী ঃ

«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ـ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ»ـ (الكافرون : ١-٢)

'বলুন, হে কাফিরগণ তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না।' (কাফিরুন ঃ ১-২)

মহান প্রভুর এ বাণীও এর প্রমাণ বহন করে ঃ

«مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ ـ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الأَخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ»ـ (هود : ١٥- ١٦)

'যেসব লোক শুধু এ দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী

হয়, তাদের কাজ কর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি, আর তাতে তাদের প্রতি কোনরূপ কমতি করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (তখন তারা জানতে পারবে) তারা দুনিয়ায় যা কিছু বানিয়েছে তা সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে।' (হূদ ঃ ১৬)

এ আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যার উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া লাভ করা, কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা হবে একমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থে কিংবা কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়বে অথবা শত্রুতা করবে একমাত্র পার্থিব স্বার্থে তাহলে সে দুনিয়ায় ততটুকুই পাবে যা তার ভাগ্যে নির্ধারণ ছিল, পরকালে তা বাতিল ও মূল্যহীন বলে গণ্য হবে। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"۔

"নিয়তের উপরেই কর্মের ফলাফল নির্ভর করে।" (বুখারী)

যখন তার কর্মকান্ড সবই দুনিয়াবী স্বার্থে হবে তখন পরকালে তার কোনই উপকারে আসবে না। কেননা যে আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হবে না তাতে কোনই কল্যাণ নেই। এ কারণেই প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তার কর্মকান্ড আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। মহান

আল্লাহ্ বলেন ঃ

«قُلْ اِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ»۔ لاَشَرِيْكَ لَهُ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ»۔ (الانعام : ١٦٢-١٦٣)

“বলুন, আমার নামায, আমার সর্বপ্রকার ইবাদাত অনুষ্ঠানসূহ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহ্রই জন্য। তাঁর শরীক কেউই নাই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী হয়েছি আমি নিজে।” (আনয়াম ঃ ১৬২-১৬৩) তবে যদি নিয়্যতের মাঝে কিছুটা গোলমাল বেধে যায় কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য এসে যায় কিছু আমলের ক্ষেত্রে তাহলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেবে না।

এই শিরক হচ্ছে ইবাদতে শিরক। কেননা, সে কাজ করছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নয় বরং তার উদ্দেশ্য অন্যকিছু, হয়ত কোন প্রতিমা বা মূর্তি কিংবা কবর অথবা মৃত ব্যক্তি ইত্যাদি। এটি হচ্ছে বড় শির্কের অন্তর্গত। এ হচ্ছে প্রাথমিক জাহেলী যুগের শিরক। যেমন- আল্লাহ্ বলেন ঃ

«مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى»۔ (الزمر : ٣)

"আমরাতো এদের ইবাদত করি কেবল এই জন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।" (যুমার ঃ ৩)

তারা তাদের ইবাদাতগুলোকে তাদের প্রতিমা ও মূর্তির জন্য নিবেদিত করেছিল। তাদের দাবী ছিল যে, তারা এসব করছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে গেছে এমন এক পথে যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং ভালবাসেন না এবং ইবাদতের জন্য সে পন্থা তিনি অনুমোদন করেননি।

তৃতীয় প্রকারঃ আনুগত্যে শিরক। তা হল আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে বিধান রচনা ও ফয়সালার ক্ষেত্রে সমান করে দেয়া। যে বিধান দেয়া-ফয়সালা করা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অধিকার। যেমন তিনি বলেন ঃ

«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ»۔ (الانعام : ٥٧)

অর্থাৎ- 'বিধান দেয়ার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর।' (আনয়ামঃ ৫৭) তিনি আরো বলেন ঃ

«وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّهُ»۔(المائدة : ٤٩)

'আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সেই মোতাবেক।' (মায়েদা ঃ ৪৯) তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

«أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ»۔ (الشورى : ٢١)

'তাদের কি এমন কোন শরীক রয়েছে যারা তাদের জন্য জীবন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ্ দেননি।' (শুরা ঃ ২১) মহিমাময় প্রভু বলেন ঃ

«اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ»۔ (التوبة : ٣١)

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং এভাবেই মরিয়ম পুত্র ঈসাকে। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই প্রভু যাঁর ছাড়া আর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নয়। তিনি পুত পবিত্র তারা যে শিরক করে তা হতে।' (তাওবা ঃ ৩১)

নবী করীম (সঃ) এর ব্যাখ্যা এভাবে দেন যে তারা কোন হালালকে হারাম করে দিলে বা হারামকে হালাল করে দিলে তারা তা মেনে নিত আর এটাই হল তাদেরকে প্রভু বানিয়ে নেয়া। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দাবী করবে যে, কারো বিধান রচনার অধিকার হয়েছে, সে আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিলকৃত বিষয়কে অস্বীকার করল । আল্লাহ বলেনঃ

«وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ

الْكٰفِرُوْنَ» ـ (المائدة : ٤٤)

"যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" (মায়েদা ঃ ৪৪) সুতরাং যে কোন আদেশ ও নিষেধ দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন তিনি বলেন ঃ

«اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ» ـ (الاعراف : ٥٤)

"সাবধান তাঁরই জন্য সৃষ্টি ও নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার।" (আ'রাফ ঃ ৫৪)

নির্দেশ বলতে যে কোন কাজ করার বা বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা বা বিধান রচনা করা। পরিভাষা হিসাবে আমরা কাজের নির্দেশকে বলি 'আম্‌র' এবং নিষেধকে 'নাহি'। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, তিনিই এর অধিকারী, অন্য কেউ নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেছেন (ألا له) সাবধান তারই জন্য) বলে। অতএব এ অধিকার অন্য কারো দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। সুতরাং কেউ যদি এ বিধান রচনার অধিকার অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে 'খালিক' বা সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তা শুন্য হতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন নিয়ামত দিয়ে প্রতিপালন করছেন এজন্যই তিনি তাদের সকল কাজের বিধান দানের অধিকারী। সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন সৃষ্টির জন্য কি কল্যাণকর এবং তিনিই উত্তম বিধান তৈরীকারী। কিন্তু অন্য কেউ

সৃষ্টিকারী নয়। নিয়ামত দাতাও নয়। সে'তো নিজের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কেই অজ্ঞ। অন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে জানা দূরে থাক। এছাড়াও সে নিজের কামনা বাসনা ও আশা আকাঙ্খা দ্বারা প্রভাবিত। প্রত্যেক মানব সন্তানেরই এ অবস্থা। প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অজ্ঞ। সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানবান নয়। এজন্যই একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই বিধান রচনার অধিকারী নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ»ـ (المائدة : ٥٠)

'তারা কি পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচার ফয়সালা কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী কেউই নেই।' (মায়েদা ঃ ৫০)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে ফয়সালা করা হল জাহিলী ফয়সালা। আর উত্তম ফয়সালা হল তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁরই বিধান মত ফয়সালা করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا

بِهِ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا »۔

(النساء : ٦٠)

'হে নবী, আপনি কি সেসব লোকদের দেখেননি যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা কবার জন্য তাগুতের নিকট পৌছতে চায়। অথচ তাদেরকে তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করার আদেশ দেয়া হয়েছিল, মূলত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য পথ হতে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।' (নিসা ঃ ৬০)

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে 'যে ফয়সালা করে' তাকে এখানে 'তাগুত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর তাগুত হল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য বা অনুকরণীয় সত্তা। এতে একথাও স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে মহান আল্লাহ্ এ তাগুতকে অস্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যেন এ কথার উপর বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বিচারক নেই এবং তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করা যাবে না। এ আয়াতে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাগুতের নিকট বিচার ফয়সালা করলে শয়তান খুশী হয় আর এটি হচ্ছে বিরাট পথভ্রষ্টতা।

এ আয়াত নাযিল হয়েছে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে যারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। তাদের একজন বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থাপন করে। অন্যজন ছিল যে, কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এরপর সেটি হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট পেশ করা হয় এবং তাদের একজন পুরা ঘটনাটি তাঁর নিকট বলে। তখন তিনি সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর রাসূলের বিচারে সন্তুষ্টি হওনি? সে বলে, হাঁ। তখন তিনি তাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করেন।

শা'বী বলেন ঘটনাটি ঘটে একজন মুনাফেক ও একজন ইহুদীর মাঝে। ইহুদী বলে মুহাম্মদের নিকট বিচার করব। কেননা সে একথা ভালভাবেই জানত যে, তিনি ঘুষ খাননা এবং বিচারে পক্ষপাতিত্ব করেন না। পক্ষান্তরে মুনাফেক বলে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট বিচার করব। কেননা সে জানে যে, তাকে ঘুষ দেয়া যাবে এবং বিচারে পক্ষপাতিত্ব করান সম্ভব। এরপর তারা জুহায়না গোত্রের এক গণকের নিকট যেতে সম্মত হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এ দুটি ঘটনার মাঝে বৈপরীত্য নেই। কেননা এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে। এ দুটি ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিচার ফয়সালা হতে হবে একমাত্র কুরআন এবং হাদীস মুতাবেক। যে ফয়সালা কুরআন ও সুন্নার বিপরীত হবে তাই বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে ফয়সালা মুতাবেক কোন কিছু গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

চতুর্থ প্রকার শিরক ঃ ভালবাসার শিরক

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ্র ভালবাসার মত ভালবাসা কিংবা ভালবাসায় তারতম্য করা, এমন ভালবাসা যাতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জড়িত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ»۔ (البقرة : ١٦٥)

'কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া অপর (শক্তি) কে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে ঠিক এইরূপ ভালবাসে, যেরূপ ভালবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহ্কে, অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।' (বাকারা ঃ ১৬৫) অর্থাৎ, মুশরিকেরা কেউ কেউ আল্লাহ্র সমকক্ষ কাউকে মনে করে, তাকে আল্লাহ্র মত করে ভালবাসে অথবা আল্লাহ্র চেয়ে বেশি ভালবাসে তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে তারতম্যের কারণে। কিন্তু মুমিনগণ আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, মুশরিকদের তাদের উপাস্যদের ভালবাসার চেয়েও। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, মুমিনেরা আল্লাহ্কে ভালবাসে মুশরিকদের ভালবাসার চেয়েও অনেক গুণ বেশি। কেননা মুশরিকদের ভালবাসা শিরক মিশ্রিত কিন্তু মুমিনদের ভালবাসা খাঁটি ও অকৃত্রিম একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে।

এখানে মহব্বত বলতে বুঝায় ভালবাসার শেষ প্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা। নবী করীম (সঃ) তাঁর প্রভুর কথা বর্ণনা করে বলেন ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ"۔

"আমি শরীকদের শির্ক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল তাহলে আমি তাকে ও তার শির্ককে প্রত্যাখ্যান করি।" এজন্যই মুশরিকদের আল্লাহর জন্য ভালবাসা বাতিল বলে গণ্য হবে যার কোন মূল্য নেই। তারা এর কোন প্রতিদান পাবেনা। কিন্তু মুসলমানদের ভালবাসা তাদের প্রভুর জন্য, এ ভালবাসার প্রতুত্ত্বরে আল্লাহর ভালবাসা পাবে এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- "তারা তাঁকে ভালবাসে এবং তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন।" এই ভালবাসা প্রকৃতিগত ভালবাসা নয়। প্রকৃতিগত ভালবাসা হল যেমন- সন্তান তার পিতামাতাকে ভালবাসে।

আল্লাহর ভালবাসার মাঝে কথা, কাজ, বিশ্বাস, সত্তা ও গুণাবলীও অন্তর্ভুক্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»۔

(التوبة : ٧١)

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু-অভিভাবক।' (তাওবা ঃ ৭১)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"ثَلاَثٌ مَنْ وَجَدَهُنَّ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ : أَنْ يَكُوْنَ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ"۔(رواه البخارى)

"যার মাঝে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হবে তার নিকট অন্য সবার চাইতে প্রিয়। মানুষ অন্য মানুষকে ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং সে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তনকে অপছন্দ করবে আল্লাহ তাকে যখন তা থেকে উদ্ধার করেছেন যেমন সে আগুনে নিক্ষেপ করাকে অপছন্দ করে।" (বুখারী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ"۔

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তাদের নিকট তার সন্তান, তার পিতা এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা প্রিয়পাত্র না হই।" (বুখারী, মুসলিম) ইবনে জারির

আত্‌তাবারী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

"مَنْ أَحَبَّ فِى اللّٰهِ وَأَبْغَضَ فِى اللّٰهِ وَوَالَى فِى اللّٰهِ وَعَادَى فِى اللّٰهِ فَإِنَّمَا تَنَالُ وِلاَيَةَ اللّٰهِ بِذٰلِكَ ، وَلَنْ يَّجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ وَإِنْ كَثُرَ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ كَذٰلِكَ وَقَدْ صَارَ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا ، وَذٰلِكَ لاَ يَجْدِى عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا"۔

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসল, আল্লাহর উদেশ্যেই কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কারো সাথে বন্ধুত্ব করল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কারো সাথে শত্রুতা করল সে অবশ্য আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে। কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না যদিও তার নামায, রোযা অনেক হয়। বর্তমানে অধিকাংশ লোকের ভ্রাতৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দুনিয়ার সাথে, একারণেই এরা কিছুই পাচ্ছেনা?"

যে ব্যক্তি ভালবাসার এই প্রকারগুলি নিজের ভিতর সমন্বিত করতে পারবে তাহলে: আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবে। এটিই হল দুনিয়ার অন্যান্য ভালোবাসা লাভের উপায় ও তার ভিত্তি, আর অন্য যে সব ভালোবাসা এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবেনা তাতে কোন ফায়দা

নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

«اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ»۔ (زخرف : ٦٧)

"সেদিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে মুত্তাকীগণ ব্যতীত।"(যুখরুফ ঃ ৬৭)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

«وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَسْبَابَ»۔ (البقرة : ١٦٦)

"সেদিন তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" (বাকারা ঃ ১৬৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "অর্থাৎ ভালবাসা, কেননা দুনিয়ার ভালবাসা পরকালে শত্রুতায় পর্যবর্ষিত হবে। কিন্তু দ্বীনি ভালবাসা পরকালে ভালবাসায় থাকবে এবং এর ফলশ্রুতিতে জান্নাত লাভ হবে। এটিই একমাত্র উপকারী ভালবাসা।"

এথেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সমস্ত মুমিনদের উচিৎ তাদের সকল সম্পর্কের ভিত্তি হবে আল্লাহ্ তা'য়লার ভালবাসা। এই ভালবাসা যেন তাদের সকল কাজকর্ম, কথা-বার্তা ও নিয়তের ভিত্তি হয়।

এ বিষয়টি তাদের উপর ওয়াজিব করে দেয় যে, জ্ঞান অর্জন ও হেদায়েত লাভের জন্য তারা সচেষ্ট থাকবে যা আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেছেন। কেননা এটিই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পন্থা। আল্লাহ তা'য়ালা যে জিনিসকে ভালোবাসেন তা আমল করার এবং যা

অপছন্দ করেন তা বর্জন করার সঠিক পন্থা, এ ভালোবাসার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে আল্লাহর কাছে পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নির্দেশ পালন করা ও তাঁর আনুগত্য করা। যে ভালোবাসায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকবে না তা মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের মাঝে তাঁর ভালোবাসা ও ঘৃণার মাঝে গরমিল করে দেয়। কেননা আনুগত্য তখন তার তকদীরের অনুপাতে ঘটে। আর তকদীর ভালোবাসা ও ঘৃণা দুটিকেই শামিল করে, যেমন কবি বলেন ঃ

"আমি করতে চাই তিনি যা ভালবাসেন
আমি যা কিছুই করি সবই আনুগত্য।"

৫। ভয়-ভীতিতে শিরক

ভয়-ভীতি হচ্ছে মানুষের ভিতরে কোন খারাপ কিছুর আশংকা করা। এখানে ভয়-ভীতি বলতে সর্বোচ্চ ভয়ের কথা বুঝায়, যা একমাত্র আল্লাহকেই করা উচিৎ আর কাউকে নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

« فَلاَ تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ». (آل عمران : ١٧٥)

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং একমাত্র আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হও।" (আলে ইমরান ঃ ১৭৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

« فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى ». (البقرة : ١٥٠)

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় কর।" (বাকারা ঃ ১৫০)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে সে শিরক করলো। কেননা ভয় করার ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র নিদেশ রয়েছে এ জন্য ভয় ইবাদত বলে গন্য। এ জন্য প্রত্যেকেরই উপর অপরিহার্য কর্তব্য হল আল্লাহ্‌কে ভয় করা। ভয় তখনই ইবাদত বলে গণ্য হবে যখন এর জন্য তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে–

(ক) ভয় যেন চূড়ান্ত পর্যায়ে হয়।

(খ) ভয়এর সাথে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে কিংবা আল্লাহ্ রহমতের ব্যাপারে নিরাশ ও হতাশ থাকে। কেননা, অধিকাংশ মানুষ যখন তাদের উপর ভয় প্রভাব বিস্তার করে তখন আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ে পড়ে। সে পাপের কারণে শুধু শাস্তিই দেখতে পায়, রহমত ও নেকী তার চোখে পড়ে না। আর এ কারণে তখন সে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে খারাপ ধারণা করে। অথবা ভয় তার মাঝে প্রবল হলে সে নিজের ব্যাপারে ফয়সালা করে নেয় যে, আল্লাহ্‌র আযাবের কবলে পড়েছি এরপর সে আর কোন পাপ-অপরাধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।

(গ) ভয়ের সাথে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুগত ভাব যুক্ত থাকে। কারণ, এসব যুক্ত না থাকলে আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয় এবং তওবাকারীদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদার প্রতি আস্থা থাকে না। ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন ভীতির দাবী মিথ্যুকদের দাবী, যারা

আল্লাহ্‌র ভয়ের কথা বলে দাবী করে অথচ তাঁর আদেশ নিষেধের প্রতি অনুগত নয়।

ভয় তিন প্রকার। তাহল–

১। শিরকী ভয়। এটি আবার দুভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথমতঃ গোপনীয় ভয় (বিশ্বাসগত ভয়)- যেমন, মূর্তি কিংবা প্রতিমাকে ভয় করা। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের মূর্তি ও প্রতিমার ভয় দেখিয়েছিল। মহান আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলেন–

«وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ »- (الزمر : ٣٦)

"আর তারা আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের ভয় দেখায়।" (যুমার ঃ ৩৬) যেমনটি আজকে মুনাফিকদের অবস্থা মুসলমানদের মাঝে ভয়-ভীতি ছড়ানোর ক্ষেত্রে। মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে বলেন–

«اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ»- (ال عمران : ١٧٣)

'আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় কর, এই কথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং উত্তরে তারা বলল যে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকতা।' (আলে ইমরান ঃ ১৭৩)

এই প্রকার শিরকের স্থান হল অন্তর (ক্বলব) এই জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসগত (আক্বীদাগত) শির্ক। এইটি বড় শিরকের অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রকার শির্ক ঃ আমলগত ভয়।

এটি হল কোন মানুষের ভয়ে ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করা কিংবা হারাম কাজ সম্পাদন করা। আর এ হল পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। এটি হল ছোট শির্ক। এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

«اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ»- (ال عمران : ١٧٣)

'আর যারা তাদের বলেছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় কর।' (আলে ইমরান ঃ ১৭৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُغَيِّرَهُ ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّ خَشِيْتُ النَّاسَ . فَيَقُوْلُ : إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى - (رواه أحمد وغيره)

'মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বান্দাকে বলবেন, তুমি অন্যায়

দেখার পরেও তা পরিবর্তন করনি কেন? এপথে তোমাকে কি বাধা দিয়েছিল? তখন সে বলবে, হে প্রভু, আমি মানুষকে ভয় করেছিলাম। তখন তিনি বলবেন, তোমার উচিত ছিল একমাত্র আমাকেই ভয় করা।' (আহমদ ও অন্যান্যরা)

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিগত ভয়–যেমন প্রকৃতগত ভাবে মানুষ বাঘ-সিংহ, কিংবা শত্রুকে ভয় করে ইত্যাদি। এ ভয় জায়েয। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসা (আঃ)-এর অবস্থা চিত্রিত করে বলেন ঃ

«فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ»- (القصص : ٢١)

'অতপর তিনি সেখান হতে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে।' (কাসাস ঃ ২১)

তৃতীয়তঃ একত্ববাদের ভয়- তাহল সর্বাত্মকভাবে আল্লাহকে ভয় করা। এর বিপরীত হল শিরকী ভয় যার উল্লেখ এইমাত্র করা হল।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ তাওয়াক্কুল বা ভরসার ক্ষেত্রে ভয় :

তাওয়াক্কুল বা ভরসা হল আল্লাহর নিকট সবকাজের ভার ন্যস্ত করা, তার উপর আস্থাবান হওয়া কোন প্রার্থিত বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে এ অর্থে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল করা জায়েয নয়। কেননা তা হল ইবাদত। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর এ বাণীতে মুমিন বান্দাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

«وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ»- (الفرقان : ٥٨)

"আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি যিনি মৃত্যুবরণ করেন না।' (ফুরকান ঃ ৫৮) তিনি আরো বলেন ঃ

«وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ»۔ (ابراهيم : ١٢)

'আর আল্লাহর উপর যেন ভরসা করে ভরসাকারীগণ।' (ইব্রাহীম ঃ ১২)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

«وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ»۔ (المائدة : ٢٣)

"তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মুমিন হও।" (মায়েদা ঃ ২৩) আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশই ইবাদত বলে গণ্য। সুতরাং ভরসা বা তাওয়াক্কুল হল ইবাদত। যে ব্যক্তি এই ভরসাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দিকে প্রত্যাবর্তন করবে কিংবা অন্য কারো উপর আস্থা রাখবে সে হল মুশরিক, মহাশিরক্কারী।

এই তাওয়াক্কুল হল অন্তরের আমল এবং তা তিন প্রকার-

প্রথম প্রকার ঃ শিরকী ভরসা (বিশ্বাসগত)

উপকার পাওয়ার জন্য বা বিপদাপদ দূর করার জন্য তাহল অন্তঃকরণে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর আস্থা রাখা। যেমন মূর্তি বা প্রতিমার উপর আস্থা বা ভরসা করা অথবা কোন মানুষ বা

জ্বিন বা অন্য কারো উপর ভরসা করা। আর সেটি দুই প্রকার এক ঃ অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ভরসা করা এমন বিষয়ে যার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই রাখেন। আর এ হল বড় শিরক।

দুই ঃ অন্তরে উপস্থিত জীবিত সক্ষম ব্যক্তিদের উপর ভরসা করা, যে সব বিষয়ে আল্লাহ তাদের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন ক্ষতি দূর বা কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে। এটি হল ছোট শিরক। একে প্রকাশ্য উপকরণের উপর ভরসা করাও বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ দুনিয়ায় কোন বস্তু সম্পাদন করার ব্যাপারে ভরসা করা। যেমন কোন ব্যক্তির উপর ভরসা করল তার জন্য দুনিয়াবী অথবা দ্বীনি কর্মকান্ড সম্পাদন করার জন্য। যেমন হজ্ব করার জন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করা কিম্বা কোন কিছু কেনা-বেচা করার জন্য দায়িত্ব অর্পন করা। এটি জায়েয।

তৃতীয় প্রকার ঃ তাওহীদি ভরসা।

এ ভরসাই ওয়াজিব। এটি হল অন্তরে একমাত্র আল্লাহর উপরই আস্থা-ভরসা রাখা এবং সব কাজে আল্লাহর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা। এর বিপরীতই হল শিরকী ভরসা।

ছোট শিরকের প্রকার ভেদ ঃ

এর অনেক প্রকার রয়েছে। স্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে একে নিম্নোক্ত প্রকারে সীমাবদ্ধ রাখা যায়–

এক ঃ কথা-বার্তা যা জিহবার মাধমে সংঘটিত হয় যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো নামে শপথ করা। যেমন কেউ বলল "যা আল্লাহ চান এবং আপনি চান।" এবং একথা বলা যে, বিচারকের বিচারক কিম্বা বলা যে, নবীর গোলাম বা রাসূলের গোলাম।

দুই ঃ কাজ কর্মে যেমন অশুভ ধারণা বা কুলক্ষণ ধরা এবং গনক বা জ্যোতিষীর নিকট গমন, চোর ধরার জন্য তাদের শরণাপন্ন হওয়া কিম্বা এ ধরনের ভন্ডদের উপর আস্থা রাখা।

তিন ঃ অন্তরের ক্ষেত্রে যেমন রিয়া বা প্রদর্শন বা সুনাম অর্জনের আকাংখা এবং সৎ আমলের মাধ্যমে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করার ইচ্ছা পোষণ করা।

ছোট শিরকের এসব প্রকারগুলি সবই বড় শিরকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে যদি এর সাথে অন্তরের বিশ্বাস যুক্ত হয়। তাহলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করা কিম্বা প্রথমে বিষয়টি ছিল বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ পরে তা আমলের উপর চলে আসে।

সুতরাং প্রথমোক্ত যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা তাকে আল্লাহর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

দ্বিতীয়ত যেমন মনে মনে রিয়ার ইচ্ছা করা অথবা তার কাজের উপর রিয়া প্রাধান্য লাভ করে কিম্বা তার উদ্দেশ্য হয় দুনিয়া লাভ এবং আল্লাহর উদ্দেশ্য থাকে না। শেষোক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমল চার প্রকার :

১. আমলের দ্বারা তার উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়ায় প্রতিফল লাভ, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি হাসিল করা এবং তার পরকালের কোন উদ্দেশ্যই না থাকে, তবে তাকে এ দুনিয়ায় তার প্রতিফল দেয়া হবে সে পরকালে কিছুই পাবে না। এটি হল বড় শিরকের অন্তর্গত।

২. আমলের উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষ। সে এর দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে নেকী লাভ বা শাস্তি হতে পরিত্রান পাওয়ার আশা করে না। এটি হয়ে যায় আমলে রিয়া কিংবা সুনাম অর্জন করা। এটি হল ছোট শিরক যদি তা সামান্যই থাকে এবং অন্তরে বিশ্বাসে সংযুক্ত না থাকে। কিন্তু যদি থাকে, তাহলে তা বড় শিরক বলে বিবেচিত হবে।

৩. নেক আমলের উদ্দেশ্য যদি হয় সম্পদ লাভ। যেমন কেউ মাল কামাবার উদ্দেশ্যে হজ্বে গমন করে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে অথবা গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে অথবা বড় কোন পদ বা নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করে। কিংবা কুরআন শরীফ হিফজ করে ইমাম হিসেবে নিয়োগ পাবার উদ্দেশ্যে তবে এটি ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য হবে।

৪. নেক আমল একমাত্র খালিসভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করবে কিন্তু এমন কাজ করবে যাতে বড় শিরকে নিপতিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ»۔ (المائدة : ٢٧)

"আল্লাহ তায়ালা একমাত্র মুত্তাকীদের নিকট হতেই গ্রহণ করবেন।" (মায়েদা ঃ ২৭) তার কোন আমলই কাজে আসবে না যেহেতু সে

কুফরী করেছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ»- (ابراهيم : ١٨)

'যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধুলিঝড়ের দিন।' (ইব্রাহীম ঃ ১৮)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»- (الزمر : ٦٥)

'আপনি যদি শিরক করেন তাহলে আপনার আমল বরবাদ হয়ে যাবে।' (যুমার ঃ ৬৫)

আমল বিনষ্ট হবার কারণ হল ঈমান ও তাওহীদের বিপরীত বস্তুর উপস্থিতি অর্থাৎ কুফর ও শিরক। আর আমল হল তাওহীদ ও ঈমানের রুকন। সুতরাং খালিস আমল না হলে ঈমান ও তাওহীদ কোনটিই থাকবে না। আর আমল হতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পন্থা মোতাবেক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় শিরকী আমল সম্পর্কে কথা

শিরকী আমলের সংখ্যা অনেক। একে পরিসংখ্যানে আনা সহজ নয় এজন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিরকী আমল সম্পর্কে আলোচনা করবো যা সাধারণ লোকদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, এর ভয়াবহতাও খুব বেশী এবং এর বিধিবিধানও তাদের নিকট অস্পষ্ট। এসব আমলের কিছু কিছু তাওহীদের পরিপন্থী আবার কতিপয় হল পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। আমরা এভাবেও বলতে পারি বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে। একদিকে এটি তাওহীদের পরিপন্থী আর অন্য দিকে এটি পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। এর কারণ হল এটি কখনও হয় শিরক, কুফর বা বড় মুনাফেকী অথবা হবে ছোট শিরক, কুফরী ও মুনাফেকী। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি তাওহীদের পরিপন্থী আর দ্বিতীয়টি হল পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী।

এভাবেই এর যা ওয়াসিলা বা বাহন এর হুকুমও তাই হবে যা বড় শিরকের দিকে নিয়ে যাবে তার বিধানও সেই রকম আর যা ছোট শিরকের দিকে নিয়ে যাবে তার হুকুমও সেরকমই হবে।

এসব আমল হল ঃ

এক. যাদু টোনা–এর শাব্দিক অর্থ হল অপ্রকাশ্য যাদু বা সেহের। একে সেহের এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, তা রাতের শেষভাবে

গোপনে সংঘটিত হয়। এ অর্থেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ বাণী ঃ "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا"۔
"নিশ্চয় বর্ণনা ভঙ্গিতে যাদু রয়েছে।" কেননা বর্ণনাকারীর এ সামর্থ রয়েছে যে, সে তার কথার চাতুর্যে বাস্তব বিষয়কে লুকিয়ে দেয়।

শরিয়তের পরিভাষায় ঃ যাদু টোনা হল এমন এক জিনিস যা মানুষের মনে ও শরীরে প্রভাব ফেলে যার ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে বা কাউকে হত্যা করে এবং স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ»۔ (البقرة : ١٠٢)

'অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।' (বাকারা ঃ ১০২)

আল্লাহ তা'য়ালা যাদু ও যাদুকর হতে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

«وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ»۔ (الفلق : ٤)

"এবং আশ্রয় চাচ্ছি গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারীদের অনিষ্ট থেকে।" (ফালাক ঃ ৪) তারা হল যাদুকারী, যারা যাদুর গিটে ফুঁ দিত। বাস্তবিকই যাদুর কার্যকারিতা রয়েছে, এজন্যই তা থেকে আমাদেরকে পানাহ চাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাদু করা লোকদের উপর যাদুর প্রভাব প্রকাশ পয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

«وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ»- (الاعراف : ١١٦)

'এবং তারা বিরাট যাদু প্রদর্শন করল।' (আ'রাফ ঃ ১১৬) তাদের যাদুকে বিরাট বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদি বাস্তবেই পরিলক্ষিত না হত তাহলে এভাবে অভিহিত করা হত না। যাদু খেয়াল হতে পারে তা একথায় খন্ডন করা হচ্ছে না। যেমন আল্লাহ ফেরাউনের যাদুকরদের যাদুর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

«يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى»- (طه : ٦٦)

'তার কাছে খেয়াল হল যে, তাদের যাদুর জোরে সেগুলি (রশিগুলি) দৌড়াচ্ছে।' (তা-হা ঃ ৬৬) অর্থাৎ মুসার (আঃ) মনে হয়েছিল রশিগুলি যাদুর প্রভাবে সাপ হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। অতএব যাদু দুই প্রকার-

এক. বাস্তব (হাকিকী) যাদু

দুই. খেয়ালী (কাল্পনিক) যাদু

এর অর্থ এই যে যাদুকর বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। সে একজন মানুষকে বানর বানাতে অথবা একটি বানরকে গরুতে রূপান্তরিত করতে পারে না। যাদুকর ও তার যাদু নিজে নিজেই কোন কিছুতেই প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম নয় যতক্ষণ না আল্লাহর নির্ধারনের সাথে তা সংশ্লিষ্ট হয় কিন্তু দ্বীন-শরিয়তে তার অনুমতি দেয়নি। যেহেতু যাদুকে তিনি হারাম ঘোষণা করেছেন সেহেতু শরয়ী অনুমতির কোন প্রশ্নই উঠে না। তিনি বলেন ঃ

«وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ»-

'তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না।' (বাকারা ঃ ১০২)

যাদুকরের জন্য শরীয়তের ফয়সালা ঃ যাদুকর কাফের, সে ইসলাম থেকে খারিজ, যাদু হল কুফরী, যাদু ইসলাম হতে মানুষকে বের করে দেয়। এটি হল বড় কুফরীর অন্তর্গত। যদি কেউ এর উপর মারা যায় তাকে ক্ষমা করা হবেনা এবং তার সব আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

যাদুকরের শাস্তি হল তাকে মুরতাদ হিসেবে (দ্বীন পরিত্যাগকারী) হত্যা করা হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী হতে যাদুকরকে হত্যা করার কথা সাব্যস্ত রয়েছে। মুমিনদের জননী হযরত হাফসা (রাঃ) হতে একথা সঠিক সুত্রে বর্ণিত যে, তিনি তার এক যাদুকর দাসীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তাকে হত্যা করা হয়। সহীহ বুখারীতে বাজালাহ ইবনে আবাদাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) লিখেন তোমরা প্রত্যেক যাদুকর ও যাদুকারীনীকে হত্যা কর, তখন আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করি।' হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আলআযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ"۔

"যাদুকরের শাস্তি তরবারী দ্বারা আঘাত করা।" এটিই ইমাম মালেক, আহমদ ও আবু হানিফার অভিমত। ইমাম শাফেঈ বলেন

তার যাদুর কারণে যদি কেউ মারা যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে, আবু হানিফা বলেন যদি বার বার তার দ্বারা যাদু করা সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ এবং আবু হানিফার মতে তাকে হত্যা করা হবে মুরতাদ হিসেবে। ইমাম শাফেঈর মতে যদি তার যাদুর কারণে কেউ মারা যায় তাহলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। তার কুফরীর ব্যাপারে কথা হল যে, যদি কথা বা কাজে কুফরী প্রমাণিত হয় তাহলে সে কাফের। যদি কুফরী প্রমাণিত না হয় তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে না। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে যাদু হারাম এবং কবীরা গুনাহ বরং তা হলো ধ্বংসকারী মহাপাপ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ ..."ـ الخ

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলি কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা। যাদু করা ...।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর যে যাদু করা হয়েছিল, তা ছিল তাঁর শরীরের উপর প্রতিক্রিয়াশীল, জ্ঞানের উপর নয়, এজন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন জিবরাইল ও মিকাইল

ফিরিশতাদ্বয় তাঁকে সূরা ইখলাস, ফালাক এবং সূরা নাস পড়তে বলেছিলেন তখন তিনি তাদের কথা বুঝতে পারেন এবং তা পাঠ করেন যার ফলে আল্লাহ্ তাঁকে যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করেন।

আমার নিকট সঠিক ও প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে- যাদুকর কাফের, আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ»ـ (البقرة : ١٠٢)

“তারা যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই একথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুশিয়ার করে দিত যে, দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ো না।” (বাকারা ঃ ১০২) যদি এর শিক্ষা ও ব্যবহার কুফরী না হত তাহলে এভাবে সতর্ক করার কোন অর্থই হয় না।

যাদুর মধ্যে শামিল হচ্ছে যাকে মানুষ বলে হাতের কারসাজি অথবা ম্যাজিক বা রূহ হাযির করা ইত্যাদি; যা ভণ্ড ও প্রতারকদের কাজ।

যাদু হারাম এবং প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী যাদুকর কাফের। যাদুক্রিয়া করাও হারাম, কেউ যদি যাদুকরের শরণাপন্ন হয় তাহলে সে ছোট কুফরী করল এবং তা মহাপাপ বলে গণ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَثِيْرًا

كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ»۔ (رواه عبد الرزاق عن صفوان بن سليم)

'যে ব্যক্তি যাদু বিদ্যা শিক্ষা করল তা কম হোক বা বেশী হোক আল্লাহ্র সাথে তার সেটাই সর্বশেষ অঙ্গীকার।' (মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, সাফওয়ান ইবনে সুলাইম)

যাদুবিদ্যা শিরকী কাজ কেননা তাতে শয়তানের সাহায্য নিতে হয়। শয়তানের সাহায্য ছাড়া যাদু হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ"۔ (رواه النسائى وحسنه ابن مفلح)

'যে ব্যক্তি কোন গিট দিয়ে তাতে ফুঁ দিল, সে যাদু করল। আর যে যাদু করল, সে শিরক করল। আর যে কোন কিছু লটকালো তাকে তার দিকে ঠেলে দেয়া হবে।' (নাসাঈ, ইবনে মুফলেহ এ হাদীসটিকে হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন)

২। ভবিষ্যৎ গণনা

কাহানা বা ভবিষ্যৎ গণনা বলতে ভবিষ্যতের জ্ঞান অন্বেষণ এবং তথ্য জানা বুঝায়, মনের খবর বলে দেওয়াও বুঝায়। সুতরাং

ভবিষ্যৎ গণনাকারী বা জ্যোতিষী প্রকারান্তরে গায়েবের জ্ঞানের দাবীদার কিন্তু গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন, অন্য কেউ জানেনা। মহান আল্লাহ্ বলেন–

«عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ـ اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا »ـ (الجن : ٢٦-٢٧)

"তিনি তো গায়েব অবহিত, স্বীয় গায়েব সম্পর্কে কাউকেও অবহিত করেন না। সেই রাসূল ভিন্ন যাকে তিনি গায়েবী কোন জ্ঞান দেয়ার জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন। তখন তার সামনে ও পিছনে তিনি প্রহরা লাগিয়ে দেন।" (জ্বিন : ২৬-২৭)

জ্যোতিষী যা বলে তা যদি বাস্তবে কখনো ঘটেও যায় তখন বুঝতে হবে শয়তান আকাশ থেকে তথ্য চুরি করে তা জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, আর এর সাথে সে আরও নিরানব্বইটি মিথ্যা তথ্য জুড়ে দিয়েছে। এজন্য জ্যোতিষীদের কথা শতকরা একভাগের বেশী সত্য বলে প্রমাণিত হয়না। নিরানব্বই ভাগই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। এজন্য জ্যোতিষীও জোর দিয়ে বলতে পারে না যে,, সেটা অবশ্যই ঘটবে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট যে, জ্যোতিষী যে মনের খবর বলে বা ভবিষ্যৎবাণী করে তার সবই মিথ্যা। এরা সহজ সরল

লোকদেরকে প্রতারিত করে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ গ্রাস করে। এরা সমাজে বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার, বিভ্রান্তি এবং ঈমানের পরিপন্থী বিষয় ছড়ায়।

এজন্যই জ্যোতিষী ও তার বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন, হস্তরেখা পাঠ এ সবই হারাম। এ ছাড়াও চোরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের ধরার প্রক্রিয়া কিংবা রুমাল ঘুরিয়ে চোর ধরা বা এ ধরণের কর্মকান্ড সবই হারাম। জ্যোতিষী কাফের, আল্লাহর সাথে বড় কুফরীকারী। কেননা সে গায়েবের জ্ঞানের দাবী করে যা একমাত্র আল্লাহই জানেন, যে ব্যক্তি তার কাছে এই বিশ্বাস নিয়ে আসে যে, সে গায়েবের খবর জানে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের, আল্লাহর সাথে বড় কুফরীকারী কিন্তু যে ব্যক্তি জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করে না কিন্তু তার কাছে আসল সে কি করে তা দেখার জন্য কিন্তু তাকে সৎকাজের আদেশ বা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার জন্য কোন ভূমিকা রাখে না, অথবা তার আসে শুধু এই জন্য যে এতে কোন ক্ষতি নেই। ওর কথা মোতাবেক হলে তো ভালই আর না হলেও কোন ক্ষতি নেই। তাহলে এটি ছোট কুফরী এবং মহাপাপ বলে গণ্য হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"مَنْ اَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"-

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর কাছে আসল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস

করল তাহলে সে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল।" (আবু দাউদ)। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও হাকিমসহ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে :

"مَنْ اَتى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"۔

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের নিকটে আসল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল তাহলে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপরে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

"مَنْ اَتى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا"۔

"যে ব্যক্তি গণকের নিকটে আসল এবং তার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করল, তখন সে তাকে যা বলে তা বিশ্বাস করল, তাহলে তার চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায কবুল হবে না।" (মুসলিম)

যে ব্যক্তি গণকের নিকটে আসল ও তাকে বিশ্বাস করল তার ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রহঃ) হতে দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

১. সে হল কাফের, ছোট কুফরী কারী। সম্ভবত এটিই বলিষ্ঠ অভিমত।

২. তাকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে কোন কিছু বলে অভিহিত করেন নি। এ জন্য বলা যাবে না যে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।

গণকের হুকুমের সাথে থালা-বাসন বা কাপ-পিরিচ বা আলিফ, বা, তা, সা পড়া কিংবা মাটিতে দাগ টানা সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য করা হয়েছে।

তিন ঃ যাদু ছুটান (নুশরা)

ইবনে আসির বলেন কাউকে জ্বিনে ধরলে বা কেউ যাদুতে আক্রান্ত হলে যে চিকিৎসা করা হয় তাকে যাদু ছুটানো বলে। এখানে যাদু ছুটানো বলতে আমরা আক্রান্ত ব্যক্তির তদবির বা চিকিৎসা বুঝি, আর তা দুই প্রকার– প্রথমত, যাদু দিয়ে যাদু ছুটানো, এটি হারাম, এটি ছোট কুফরী। ইমাম হাসান (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন যাদু একমাত্র যাদুকরই ছুটায়। যেহেতু, যাদুকর শয়তানের সহায়তায় যাদু ক্রিয়া বন্ধ করে এজন্য তা হারাম। দ্বিতীয়ত, দু'আ দরূদ, কুরআন-হাদীস ও বৈধ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে যাদু ছুটানো, এটি জায়েয।

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যাদু ছুটানো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ "এটি (যাদু দিয়ে যাদু ছুটানো) শয়তানী কাজ।" (আহমদ)

তিনি আরো বলেন (لَاتَدَاوُوْا بِحَرَامٍ) তোমরা হারাম দ্বারা চিকিৎসা করনা। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

"مَا جَعَلَ اللّٰهُ شِفَاءَ أُمَّتِىْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا"-

'আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের জন্য হারাম বস্তুতে আরোগ্য রাখেননি।' সুতরাং যাদু দ্বারা যাদু ছাড়ান শয়তানের কাজ এবং হারামী কাজ, যদিও এতে আরোগ্য লাভ হয় তবুও তা হারাম। কেননা হারাম দ্বারা চিকিৎসা করাও হারাম। এর দ্বারা বিশেষ জরুরী অবস্থার কথা ধরা হচ্ছেনা। কেননা জরুরতের জন্য কিছু ছাড় রয়েছে যা সবার নিকট সুবিদিত। যাদু কোনক্রমেই জরুরী অবস্থার মধ্যে পড়ে না, কেননা যাদুর দ্বারা কারও মৃত্যু আশংকা করা হয় না যদিও যাদুর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। বর্তমান সময়ে যদিও হিংসা হানাহানির কারণে যাদুর দ্বারা অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার জন্য অনেকেই যাদুকরের দ্বারস্থ হচ্ছে। তবুও এটি জায়েয নয় বরং এর মাধ্যমে সমাজে কুসংস্কার ছড়াচ্ছে।

চার. নক্ষত্রের জ্ঞান (তানজীম) আভিধানিক অর্থ নক্ষত্রের মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ করা। পরিভাষায় বলা হয় নক্ষত্রের মাধ্যমে কোন কিছুর লক্ষণ বুঝা।

কুরআন মজীদে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

১. দিক নির্ণয়। এ জন্য এটি আলামত বা নিদর্শন যেন এর মাধ্যমে মূল দিক ও এর শাখা প্রশাখা বা অন্যান্য দিক নির্ণয় করা যায়।

২. এর মাধ্যমে পথিক তার দেশের দিক বা পথ ধরে চলতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন–

«وَعَلَامَاتٍ ط وَبِالنَّظْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ»- (النحل : ١٦)

'নিদর্শন সমূহ এবং তারকার মাধ্যমে তারা পথের দিশা পায়।'

৩. দুনিয়ার আকাশের জন্য সৌন্দর্য।

৪. যে সকল শয়তান আকাশের তথ্য চুরি করতে উর্ধ্বাকাশে গমন করে সে শয়তানগুলিকে উল্কাপিন্ড দিয়ে আঘাত করা হয়।

«وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ»- (الملك : ٥)

'আমরা পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি।' (মুলক ঃ ৫)

সুতরাং কেউ যদি এতে অন্য কোন ফায়দা রয়েছে বলে দাবী করে তাহলে তাকে অবশ্য কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ পেশ করতে হবে। কেননা কারো কোন কথারই মূল্য নেই কুরআন ও হাদীসের দলীল ছাড়া, তাতে সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন।

নক্ষত্রের জ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত–

এক ঃ প্রতিক্রিয়াগত জ্ঞান।

যেমন– পৃথিবীতে সংঘটিত, ঘটনাবলীর কারণ হিসাবে নক্ষত্রের অবস্থানকে নির্ণয় করা। যেমন এ নক্ষত্র উঠছে অতএব এটা হবে বা

ঐ নক্ষত্র উদিত হয়েছে তাহলে এটা হবে। কেউ যদি এটা মনে করে যে, এ নক্ষত্রের প্রভাবে এগুলি ঘটছে বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটছে তাহলেও সে মুশরিক। বড় শিরককারী এবং সে ইসলামের গন্ডি হতে খারিজ হয়ে যাবে।

আর যদি মনে করে যে, দুনিয়ার ঘটনার সাথে তার সংযোগ রয়েছে তাহলেও মুশরিক, ছোট শিরককারী। পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী।

দুই ঃ নক্ষত্রের চলার গতিপথের জ্ঞান–

নক্ষত্রের গতিপথ ধরে বিভিন্ন দিক ও দেশের অবস্থান জানা ইত্যাদি। এটি জায়েয, এতে নিষেধের কিছু নেই। যেমন ঃ দিনপ ীর হিসাব, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতু জানা, ফসল বোনার সময় ফসল কাটার সময় জানা ইত্যাদি।

"مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُوْمِ فَقَدْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ"-(رواه أبو داود وإسناده صحيح)

'যে ব্যক্তি নক্ষত্রের কিছু শিক্ষা করল সে যাদুর কিছু শিখল সে বেশী শিখল বা আরো বেশী।' (আবু দাউদ- হাদীসটির সনদ সহীহ্) এ হাদীসের উদ্দেশ্য প্রথম প্রকারের, কেননা নক্ষত্রের অবস্থা জানা শয়তানী কাজ যে এর মাধ্যমে এ ঘটবে ও ঘটাবে এজন্য একে

যাদুর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ তারকার দ্বারা বৃষ্টিপাত কামনা–

এর অর্থ হল তারকার মাধ্যমে বৃষ্টিপাত কামনা করা বা ঐ তারকা দেখা গেলে বৃষ্টি হবে ইত্যাদি ধারণা করা।

একাজ হারাম কেননা সব কাজের মূল শক্তি আল্লাহ্‌র হাতে। কেউ যদি নক্ষত্রের দ্বারা বৃষ্টি লাভের বিশ্বাস রাখে সে কুফরী করল। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ"۔

'আমার কিছু বান্দার সকাল হয়েছে আমার প্রতি ঈমান এনে আর কতিপয় আমার সাথে কুফরী করে। যারা বলে আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার প্রতি ঈমান রাখে আর তারকাকে অস্বীকার করে। আর যারা বলে ওমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার সাথে কুফরী করল এবং নক্ষত্রের উপর ঈমান আনল।'

কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, নক্ষত্রই বৃষ্টি দেয় বা নক্ষত্রই বৃষ্টি হবার কারণ তাহলে সে বড় শিরককারী। অথবা এ বিশ্বাস পোষণ করে

যে, ওমুক নক্ষত্রের কারণেই বৃষ্টি হয়েছে যদিও তার বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহর হুকুমেই বৃষ্টি হয়েছে তাহলেও এ ধারণা করা হারাম এবং এটি ছোট শিরক যা পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। কেউ যদি বলে ঐ নক্ষত্র উঠার সময় বৃষ্টি হয়েছে বা ঐ নক্ষত্র অদৃশ্য হবার পর বৃষ্টি হয়েছে তা হলে তা জায়েয। কেননা এটি বৃষ্টি হবার সময়কাল জানান বৈ অন্য কিছু নয়। এতে বৃষ্টিপাত নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটছে বলে কোন বিশ্বাস নেই। নক্ষত্রের (হারাম) হুকুমের মাঝে বাতাসের গতিপথ পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তন, তাপমাত্রার পরিবর্তন ইত্যাদিও শামিল।

অনেক মানুষই এতে বিভ্রান্ত হয় এবং সৃষ্টিকর্তার দিকে কাজের সম্পৃক্ততা না করে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করে বা তাকেই কর্তা বা ক্রিয়াকারক বলে দাবী করে বা এর সাথে সম্পৃক্ত করে যার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের ব্যাপারে আশংকা করেন যে তারা এ বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে যা শিরকে খফী বা অপ্রকাশ্য শিরক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلى أُمَّتِى ثَلاَثٌ : الاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدْرِ"۔

(رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده عن جابر السوائى)

'আমি আমার উম্মতের জন্য তিনটি জিনিসের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আশংকা করছি ঃ নক্ষত্রের নিকট পানি চাওয়া, শাসকের অত্যাচার এবং তাকদীরকে অস্বীকার করা।' (আহমাদ, জাবের আস্ সুওয়াঈ) এটি হল আল্লাহ্র নিয়ামতকে অস্বীকার করা এবং অন্যের উপর আস্থা ও ভরসা করা। এটি ভ্রান্ত ধারনা বিশ্বাসের পথ খুলে দেয় যা সাবিয়ীদের বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়, যারা গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রতিমার পূজা করে যা আল্লাহ্র রবুবিয়্যতে শিরক এর অন্তর্গত। কেননা তারা মূল সৃষ্টিকারীকে অস্বীকার করে অন্যের দিকে তা সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ্র অধিকারকে অন্যের দিকে নিয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ : اَلْفَخْرُ بِلأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ"-(رواه مسلم)

'চারটি জিনিস জাহেলিয়াতের কাজ তারা তা পরিত্যাগ করবে না। বংশ নিয়ে অহংকার করা, অন্যের বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি চাওয়া এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।' (মুসলিম)।

ছয় ঃ অশুভ ধারণা (তিয়ারাহ)

কোন কিছু দেখে কুলক্ষণ বা অশুভধারণা করা। মূলে হল তাতাইউর বা উড়া। কোন কাক-চিল বা শকুন ইত্যাদি উড়তে দেখে কুলক্ষণ মনে করা। আরবরা পাখি উড়িয়ে বা জীব জন্তু ছেড়ে দিয়ে লক্ষণ বা

অশুভ বিবেচনা করত। পাখি উড়ে ডান দিকে চলে গেলে শুভলক্ষণ মনে করত, বামে গেলে অশুভ লক্ষণ বলে ধরে নিত। কেউ আবার উল্টাটি করত।

ইসলামের আবির্ভাবের পর এসব ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করল এবং এ ব্যাপারে নিষেধ করল। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট করে দিল যে, কল্যাণ বা অকল্যাণের এতে কোনই প্রভাব নেই। এথেকেই বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি, জন্তু, রং এর বাপারে অশুভ কিছু গ্রহণ করলেই তা তিয়ারা বা অশুভ ধারণা করা যা শরিয়তে নিষিদ্ধ।

কুলক্ষণ ধরা শরীয়তে হারাম। এটি ছোট শিরকের অন্তগর্ত যা পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। কেউ যদি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এসব বস্তুই প্রকৃত নিয়ন্তা বা ভাল মন্দ করতে সক্ষম তাহলে তা হবে বড় শিরক, তাওহীদের পরিপন্থী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ"-

"কুলক্ষণ ধরা শিরক, অশুভলক্ষণ ধরা শিরক, অশুভলক্ষণ ধরা শিরক।" কুলক্ষণ কথা এবং কাজেও হতে পারে এবং মুমিনের দ্বারাও হতে পারে। ইবনে মাসউদ বলেন আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যার এমনি ধরণের অশুভ ধারনা হয় না কিন্তু আল্লাহ তাওয়াক্কুল-এর দ্বারা তা দুর করেন। এর অর্থ হল আমাদের সবারই মাঝে কুধারণা চলে আসে কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা করলে তা

দূর হয়ে যায়।

সহীহ মুসলিমে মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আস্ সুলামী হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-হে আল্লাহর রাসূল আমাদের কেউ কেউ অশুভলক্ষণ গ্রহণ করে। তিনি বলেন ঃ "তোমাদের কেউ কেউ তা মনের মাঝে অনুভব করে কিন্তু তা যেন তাদেরকে কোন কাজ করা থেকে বাধা না দেয়।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অশুভলক্ষণের কাফফারার বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، قَالُوْا : فَمَا كَفَّارَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ أَن يَّقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ". (رواه أحمد)

'যাকে তার কাজ থেকে কুলক্ষণ ফিরিয়ে দেবে সে শিরক করল। তারা বললো এর কাফ্ফারা কি? তিনি বলেন, সে যেন বলে, "আল্লাহুম্মা লা-খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওলা-তাইরা ইল্লা তাইরুকা, ওলা ইলাহা গাইরুকা" অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই। আপনার অশুভলক্ষণ ছাড়া অন্য কোন অশুভলক্ষণ নেই এবং আপনি ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নেই।'(আহমাদ)

কুলক্ষণ ধরা বেশ কিছু কারণে হারাম করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

এক. কুলক্ষণ ধরায় কল্যাণ ও অকল্যাণ-এর ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে সম্পৃক্ত করা হয়।

দুই. এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ভরসা করা হয়।

তিন. এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

চার. এতে বান্দার মনে ভয় সৃষ্টি হয় এবং খারাপ থেকে নিরাপদ মনে হয় না, যার ফলে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীতে তার খিলাফতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

পাঁচ. কুলক্ষণ হলো সমাজে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ছড়াবার মাধ্যম, যার কোন ভিত্তি নেই, যা বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

সাত. তাবিজ-কবজ

তাবিজ কবজ বলতে মানুষ যা গলায় বা হাতে বা অন্য স্থানে ঝুলায় বা বাঁধে উপকার পাওয়ার জন্য বা ক্ষতি দূর করার জন্য তা কুরআন, সুতা কংকর বা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা হোক না কেন। আরবেরা তাদের ভ্রান্ত ধারনা মোতাবেক তাদের সন্তানদের গলায় এসব ঝুলাত কুনজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য।

তাবিজ-কবজ দুই প্রকার-

১ম প্রকার ঃ যা কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কিছুর দ্বারা করা হয়, আর

তা শরীয়তে হারাম। যদি এ বিশ্বাস রাখে যে, সেটিই নিয়ন্তা অথবা তাবিজ ক্রিয়াশীল হবার কারণ, তাহলে সে মুশরিক, বড় শিরককারী এবং যদি বিশ্বাস করে এর সাথে তার সংযোগের তাহলে ছোট শিরককারী। সহীহ মুসলিমে আবু বশীর আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কতিপয় সফরে সঙ্গী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন প্রতিনিধি পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় চামড়ার মালা বা অন্যকোন মালা থাকলে যেন কেটে ফেলা হয়। মুসনাদে আহমাদে ও আবু দাউদে ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ

"إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ"۔

'ঝাড়ফুঁক, তাবিজ এবং তিওয়ালা শিরক।' তিওয়ালা এক ধরনের যাদু কর্ম যা মেয়েরা স্বামীর ভালবাসা পাবার জন্য করে থাকে।

তাবীজ হারাম হবার কারণ হল এর দ্বারা মানুষের মন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ঝুঁকে পড়ে, তার ওপর আস্থাশীল হয় এবং এক ভ্রান্ত ধারণার দরজা উন্মুক্ত করে যা বড় শিরকের দিকে ধাবিত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَّلَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ"۔

'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে আল্লাহ তাকে তার দিকেই ঠেলে দিবেন।' আর আল্লাহ যাকে কোন কিছুর দিকে বা ঐ ব্যক্তির দিকেই

ঠেলে দিবেন সে কক্ষণও মুক্তি বা কল্যাণ পাবে না। বরং তা অপমানেরই চিহ্ন। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র তার বন্ধুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

২য় প্রকার ঃ যা কুরআন দ্বারা করা হয় -

সালফে সালেহীনগণ এ ব্যাপারে দুটি মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ একে হারাম বলেছেন।

অবস্থা দৃষ্টে বলা যায় সত্য ও সঠিক রায় হল–এটি হারাম। কেননা দলীলগুলো সবই ব্যাপকতা বহন করে। তাতে কুরআন ছাড়া এ ধরনের কোন পার্থক্য করেনি, তাছাড়া এর দ্বারা মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কুরআন নিয়ে পেশাব পায়খানায় যাওয়ার মত নিষিদ্ধ ঘটনাও ঘটতে পারে। কুরআনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য পর্যায়ে ময়লা আবর্জনার স্থানে নিয়ে যাওয়ার মত অনাকাংখিত ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া দুষ্ট ও শয়তান প্রকৃতির লোকেরা শিরকী তাবিজকে কুরআনের দোহাই দিয়ে ব্যবহার করার পথ পেয়ে যাবে।

ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ 'তাঁরা (সাহাবারা) তাবিজকে ঘৃণা করতেন তা কুরআন দ্বারাই হোক বা কুরআন ব্যতীরেকেই হোক। 'এর অর্থই হল তিনি এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনের ঐক্যমত্য (ইজমা) বর্ণনা করা। সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, যে ব্যক্তি কারো তাবিজ কেটে ফেললো সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল। এ

ধরনের কথা তিনি না জেনে বলতে পারেন না। এ জন্য এটি তাবেয়ীর মুরসাল যা প্রমাণ হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে বিবেচিত।

আট ঃ ঝাড়-ফুঁক

ঝাড়-ফুঁক বলতে কুরআন থেকে দু'আ পড়ে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁ দেয়া।

ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয। আউফ ইবনে মালেক হতে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীস এর প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ

"كُنَّا نَرْقِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ".

"আমরা জাহেলিয়াতের যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বললাম আপনি এটাকে কি মনে করেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা এমন ঝাড়ফুঁক কর যাতে শিরক না থাকে।" খাত্তাবী বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্দেশ করেছেন এবং এটাকে জায়েয করেছেন। ঝাড়ফুক জায়েয হবার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে, তাহলো–

এক. আল্লাহর কালাম বা তাঁর নাম অথবা তাঁর গুণাবলীর দ্বারা কিংবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে প্রাপ্ত দু'আ দ্বারা হতে হবে।

দুই. তা যেন আরবী ভাষায় হয়।

তিন. এর অর্থ যেন বোধগম্য হয়।

চার. এতে যেন নাজায়েয কিছু না থাকে। যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা অন্য কারো নিকট দু'আ করা কিংবা জ্বিনের নামে বা তাদের বাদশার নামে সাহায্য বা দু'আ চাওয়া ইত্যাদি।

পাঁচ ঃ এর উপরে যেন ভরসা না করে।

ছয় ঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে এসব নিজে কিছু করতে পারে না, বরং আল্লাহ ইচ্ছায় হয়।

সুতরাং যদি এসব শর্তের কোন একটি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে সেটি হারাম ঝাড়ফুঁক। যদি বিশ্বাস করে যে সেটি নিজেই ক্রিয়াশীল বা প্রতিক্রিয়ার কারণ, তাহলে সেটি হবে বড় কুফরী। আর যদি বিশ্বাস করে যে, এর সাথে আরোগ্য জড়িত তাহলে তা হবে ছোট শিরক। এর ভিত্তিতে ঝাড়ফুঁক দুই প্রকার–

জায়েয ঝাড়ফুঁক ঃ যাতে উপরোক্ত শর্ত সমূহ পাওয়া যাবে।

বিদআত ঝাড়ফুক ঃ তা হলো যাতে জায়েয ঝাড়ফুঁকের কোন একটি শর্ত পাওয়া যায় না।

যেমন–

এক. যা আরবী ভাষায় হবে না।

দুই. যার অর্থ বুঝা যাবে না।

তিন. যাতে শিরক থাকবে কিংবা জিনের নামে অথবা তাদের বাদশার নামে হবে বা যার কোন অর্থই হয়না বিচ্ছিন্ন কতিপয় অক্ষর ইত্যাদি।

চার. এ বিশ্বাস করে যে সেটি নিজেই ক্রিয়াশীল এমনকি সেটি যদি জায়েয় ঝাড়ফুক হয়।

সর্বোত্তম হলো যা কুরআন থেকে করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ»- (بنى اسرائيل : ٨٢)

“এবং আমরা কুরআন নাযিল করেছি যা হলো সকল রোগের আরোগ্য স্বরূপ এবং রহমত স্বরূপ। ” (বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

এরপর হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিখান দু'আ দ্বারা। এর দ্বারা কিছু হাদিয়া – পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয। এর প্রমাণ হলো হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস। তিনি যখন এক গোত্রের নেতাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করেন এবং এর জন্য পারিশ্রমিক নেয়ার শর্ত রাখেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি সমর্থন করেন।

নয়ঃ বালা ও সুতা ইত্যাদি দ্বারা অসুখ দূর করা কিম্বা বিপদ আপদ হটানোর চেষ্টা করা।

ক্ষতি বা উপকার আল্লাহর হাতে। কেননা তিনিই এর উপর ক্ষমাতাবান। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كشِفَاتُ ضُرِّهِ»۔ (الزمر : ٣٨)

"বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে?" (যুমার ঃ ৩৮) যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, সেগুলি নিজেই লাভক্ষতি করতে সক্ষম তাহলে সেটি হবে বড় শিরক। আর যদি এ বিশ্বাস করে যে এর সাথে কল্যাণ-অকল্যাণ জড়িত তাহলে হবে ছোট শিরক। কিন্তু একজন মুসলমান কখনও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা করতে পারে না, করা উচিৎ নয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

«وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ»۔ (ابراهيم : ١٢)

"সুতরাং ভরসাকারীগণের আল্লাহর উপরই একমাত্র ভরসা করা উচিৎ।" (ইব্রাহীম ঃ ১২) কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে অন্তরের টান রাখা বা কারো নিকট কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ হতে বাঁচার জন্য আশ্রয় নেয়া যাবে না। কোন বস্তুর উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখলে মুমিন তার মানসিক নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলবে এবং দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক হবে অস্থিতিশীল। এর ফলেই তার মাঝে দুনিয়াবি ভয়-ভীতির সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبَسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ»۔ (الانعام : ٨٢)

"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসে জুলুম (শিরক) মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি-নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী। (আনআম ঃ ৮২)

এ পৃথিবীতে মানুষের এই অস্থিরতা এটি আল্লাহ ইচ্ছার বিপরীত এবং বিপরীত হল নিশ্চিন্ততার যা আল্লাহ মানুষকে জমিনে খিলাফত দান করতে চান। কেননা অন্তরের টান এসব বস্তুর প্রতি তার সঠিক সমঝকে দুর্বল করে তুলে, তার দৃষ্টি শক্তিকে খাটো করে দেয় এবং তাকে কুসংস্কারের দিকে ধাবিত করে, যার ফলে ভ্রান্ত ধারণার দিকে ধাবিত হয় এবং নিজের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে এসব কাজের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

"عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِيْ يَدِهِ حَلَقَةً مِنْ صَفْرٍ ، فَقَالَ مَاهَذَا؟ قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ . فَقَالَ انْزِعْهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْنًا ، فَاِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا"۔

"ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে তামার একটি বালা দেখতে পেয়ে তাকে বললেন ঃ এটা কি? সে বলল এটা অসুস্থতার জন্য দিয়েছি। তিনি বললেন এটা খুলে ফেল। এটা তোমার অসুস্থতাই বৃদ্ধি করবে। কেননা তুমি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর যে, তা তোমার হাতে রয়েছে, তাহলে তুমি কখনো মুক্তি পাবে না।"

আবু হাতেম হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হুজায়ফা রাযিআল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির হাতে জ্বরের জন্য সুতা বাঁধা দেখতে পেয়ে তা কেটে ফেলেছিলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন ঃ

«وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ»۔ (يوسف : ١٠٦)

"তাদের অধিকাংশই মুশরিক যারা ঈমান আনার দাবী করে।" (ইউসুফ ঃ ১০৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ঝিনুক ঝুলাবে আল্লাহ তাকে প্রশান্তি দেবেন না। (আহমাদ) নদী বা সাগর হতে মুল্যবান ঝিনুক সংগ্রহ করে লোকজন বাচ্চাদের গলায় ঝুলাত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে (বদ) দু'আ করেন যেন তারা মনের প্রশান্তি না পায়। এথেকেই বুঝা যায় যে, এ ধরনের কাজ ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা বড় কবীরা গুনাহ্ বলে গণ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

কুফরী

কুফরের শাব্দিক অর্থ ঢেকে দেয়া। এ অর্থেই আল্লাহর এ বাণী ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

« يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ »- (الفتح : ٢٩)

"চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে- যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। (ফাতহ ঃ ২৯) এ আয়াতে কাফের বলতে চাষীকে বুঝান হয়েছে যারা বীজকে মাটির নীচে চাপা দেয় বা ঢেকে রাখে। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বুঝায় ইসলামকে পূর্ণভাবে বা এর আংশিক কোন বিষয়কে অস্বীকার করা। সুতরাং শাহাদাতাঈন–এর দাবী অস্বীকার করা কুফরী এবং কোন ওয়াজিব বিষয় বা হারামকে অস্বীকার করাও কুফরী। যেমন কেউ নামাযের ওয়াজিবকে অস্বীকার করল এবং সুদ হারাম হওয়াকে অস্বীকার করল বা আল্লাহর কোন নির্ধারিত শাস্তির বিধানকে অস্বীকার করল, যেমন চুরির শাস্তির বিধান কিংবা জেনার শাস্তির বিধান ইত্যাদি।

কুফরীর শ্রেণী বিন্যাস ঃ কুফর দুই প্রকার -

এক ঃ বড় কুফরী। এটি হল ইসলামকেই অস্বীকার করা।

দুই ঃ ছোট কুফরী। ইসলামের কোন অংশ বা যা না হলে ইসলাম পূর্ণ হয়না এসব কিছুকে অস্বীকার করা।

এই ঃ দুই প্রকার কুফরীর মধ্যে কয়েক ধরনের পার্থক্য রয়েছে–

প্রথমত ঃ বড় কুফরীতে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ»۔ (ابراهيم : ١٨)

"যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাই-ভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধুলিঝড়ের দিন।" (ইব্রাহীম ঃ ১৮) কিন্তু ছোট কুফরিতে আমল বিনষ্ট হবে না। যদিও, তাতে ঈমানের কমতি হয়।

দ্বিতীয়তঃ বড় কুফরীতে জাহান্নাম চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ»۔ (محمد : ١٢)

"আর যারা কাফির তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।" (মুহাম্মাদ ঃ ১২) এবং তিনি আরো বলেন-

«اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط أُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ»۔ (البينة : ٦)

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" (বাইয়্যেনাহ্ ঃ ৬)

কিন্তু, ছোট শিরক-এর কারণে কেউ চিরস্থায়ী জাহান্নাম-এ যাবে না। এটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। অন্য আর এক মতে সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। সেখান থেকে কখনও বের হতে পারবে না। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে একমত যে, প্রতিটির ব্যাপারে শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ বড় কুফরী করে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। কিন্তু ছোট কুফরী করে মারা গেলে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করে দিবেন, অথবা তাকে শাস্তি দিবেন। এর অর্থ এই নয় যে, তার শাস্তির ঘোষণা নেই। বরং আল্লাহ্ তার শাস্তির কথা বলেও তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

চতুর্থতঃ বড় কুফরীকারীর রক্ত সম্পদ দুনিয়ায় বৈধ হয়ে যায়, কাফের তার মুসলমান আত্মীয়ের মিরাস পাবে না এবং কোন মুসলমান কাফেরের মিরাস পাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"۔ (متفق عليه)

মুসলমান কাফের ব্যক্তির মিরাস পাবে না এবং কোন কাফের ব্যক্তি কোন মুসলমানের মিরাস পাবে না। (বুখারী, মুসলিম) কিন্তু ছোট কুফরী এ রকম কিছু নির্ধারিত করে না।

পঞ্চমতঃ বড় কুফরী ইসলামের গন্ডি হতে বের করে দেয় কিন্তু ছোট কুফরী ইসলামের গন্ডি হতে বের করে দেয়না। এর অধিকারী মুমিন, তার ঈমানে ঘাটতি রয়েছে। এই দুই কুফরীই কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠতঃ বড় কুফরী হচ্ছে কুফরে ইতেকাদী বা বিশ্বাসগত কুফরী তার সম্পর্কে হচ্ছে অন্তঃকরণের সাথে। আর ছোট কুফরী হচ্ছে কুফরে আমলী বা কর্মগত কুফরী এর সম্পর্ক হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের সাথে।

বড় কুফরীর প্রকার ভেদ ঃ এটি পাঁচ প্রকার-

একঃ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অস্বীকার (কুফরে তাকযীব) সত্যের বিপরীত দাবী করা বা এ দাবী করা যে, নবী করীম সত্যের বিপরীত জিনিস নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নিম্নোক্ত বাণী এর প্রমাণ বহন করে ঃ

« وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ط اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى

لِّلْكٰفِرِيْنَ»۔ (العنكبوت : ٦٨)

"তার চেয়ে আর কে বড় অত্যাচারী আছে? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সে সব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে?" (আনকাবুত ঃ ৬৮) সুতরাং যে ব্যক্তি এ দাবী করবে যে, আল্লাহ্ কোন জিনিসকে হারাম করেছেন বা সেটি হালাল করেছেন অথচ সে জানে যে, আল্লাহ্র আদেশ এবং নিষেধ-এর বিপরীত কিম্বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সত্যের বাণী নিয়ে এসেছেন তা প্রত্যাখ্যান করল এ দাবী করে যে, তিনি মিথ্যাবাদী কিংবা এটি সত্যের বিপরীত তাহলে সে কাফের, মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। ফেরাউনের কুফরী ছিল এ ধরনের। অধিকাংশ জাতির কুফরী হল এ প্রকারের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ»۔ (الانعام : ٦٦)

অর্থাৎ "আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলেছে, অথচ তা সত্য।" (আনআম ঃ ৬৬)

দ্বিতীয়তঃ সত্য জেনেও অহংকারবশতঃ অস্বীকার করত কুফরী করা। সে স্বীকার করে যে, রাসূল যা তাঁর রবের পক্ষ হতে নিয়ে এসেছেন তা সত্য কিন্তু সে সত্যকে অবজ্ঞা করে এর উপস্থাপনকারীকে তুচ্ছজ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ»- (البقرة : ٣٤)

"এবং যখন আমি হযরত আদমকে সিজদা করার জন্য ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (বাকারা ঃ ৩৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করবে এবং এর উপর আমল করতে অস্বীকার করবে, এর প্রতি অবজ্ঞা করবে এবং এর অনুসারীদের করবে তুচ্ছজ্ঞান, তার অবস্থা হল নুহ-এর কওমের মত। যাদের কথা মহান আল্লাহ্ এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

«قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الاَرْذَلُوْنَ»- (الشعراء : ١١١)

"তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব যখন তোমার অনুসরণ করছে নিকৃষ্টজনেরা।" (শুয়ারা ঃ ১১১)

তৃতীয়তঃ সন্দেহবশত কুফরী করা–

তা হল ইসলামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়া বা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া। কেননা ইসলামের দাবী হল যে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা এনেছেন তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ যেন এ ধারণা না করে যে, ইসলাম সত্য কিন্তু এমনওতো হতে পারে যে, তা সত্য নয়। এরকম হলে তা হবে ধারণাগত কুফরী (কুফরুজ্জন)। মহান প্রভু বলেন ঃ

«وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هذِهِ اَبَدًا - وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُ اِلى رَبِّىْ لاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا - قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّكَ رَجُلاً - لكِنَّا هُوَ اللّهُ رَبِّىْ وَلاَ اُشْرِكُ بِرَبِّىْ اَحَدًا »- (الكهف : ٣٥-٣٨)

“নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার মনে হয়না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল– তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে

মানবাকৃতিতে? কিন্তু আমিতো একথাই বলি আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।" (সূরা কাহাফ ঃ ৩৫-৩৮)

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করবে কিংবা ধারণা করবে যে, তা সত্যের বিপরীত হতে পারে। তাহলে কুফরী করল। সন্দেহপরায়ণ থাকা ও কুধারণা পোষণ করা কুফরী।

চতুর্থতঃ বিমুখতা করে যে কুফরী করে। এ হলো সত্যকে পরিত্যাগ করা। সত্যকে জানতেও চায়না এবং এর প্রতি আমলও করেনা। তা কথা বা কাজ কিংবা বিশ্বাসগতভাবেও হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا أُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ»-

(الاحقاف : ٣)

"আর কাফেররা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আহক্বাফ ঃ ৩) সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনিত বিষয় হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, যেমন বলল, আমি এর অনুসরণ করব না বা আমার এর কোন প্রয়োজন নেই কিংবা যখন ইসলামের কথা শুনল তখন সেখান থেকে না শুনার জন্য উঠে চলে যায় অথবা কানে আঙ্গুল ঢুকায় অথবা যেখানে সত্যের আলোচনা হয় সেখান থেকে পলায়ন করে কিংবা ইসলাম সম্বন্ধে জানার পরেও ঈমান না এনে তার অন্তর ও ইন্দ্রিয়কে ইসলাম থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সে

ইসলামের প্রতি বিমুখ হয়ে একে অস্বীকার করল।

পঞ্চমতঃ মুনাফেকীর মাধ্যমে কুফরী। তাহল প্রকাশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করা কিন্তু অন্তঃকরণে তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা। সে ঈমানকে প্রকাশ করে কিন্তু কুফরীকে গোপন রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ». (المنافقون : ٣)

"এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝেনা।" (মুনাফিকুন ঃ ৩)

যেহেতু বুঝা, অনুভব করা এবং পার্থক্য করার স্থান হল অন্তঃকরণ (কলব), আর যেহেতু তাদের অন্তঃকরণে কুফরীর কারণে পর্দা পড়ে গেছে সুতরাং ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। যার এরকম অবস্থা হবে সে হল কাফের, মুনাফেকী করে কুফরী। কেননা তার বাহ্যিক ভাব হল ঈমানের আর অপ্রকাশ্য রূপ হল কুফরীর।

পূর্বে যে সকল বড় কুফরীর প্রকারভেদ বর্ণনা করা হল তা কাফের বান্দার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ করা হয়েছে। উলামাগণ কুফরীকে অন্য কারণেও বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে স্থানের দিকে লক্ষ্য করে কুফরী তিন প্রকার।

১। বিশ্বাসগত কুফরী ঃ এর স্থান হল অন্তঃকরণ (ক্বলব)। যেমন কেউ আল্লাহর গুণাবলী এবং নাম সমূহ নেই বলে বিশ্বাস করল কিংবা জ্বিনের অস্তিত্ব নেই বলে বিশ্বাস করল।

২। কর্মগত কুফরী ঃ এর স্থান হল অঙ্গ-প্রতঙ্গ। যেমন কেউ কুরআন বা হাদীসের কিছু অংশকে আবর্জনায় ফেলল কিংবা আল্লাহর নাম অথবা গুণাবলী লেখা কাগজ পত্র আবর্জনায় ফেলল ইত্যাদি।

৩। কথার মাধ্যমে কুফরী ঃ এর স্থান হল জিহ্বা। যেমন কেউ আল্লাহ, রাসূল কিংবা দ্বীনকে গালি দিল ইত্যাদি।

কুফরীকে তার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করেও বিভক্ত করা যায়। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে কুফরী তিন প্রকার ঃ

১। তুলনা করে কুফরী– তাহলো এ বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লার সত্তা, গুণাবলী, তাঁর নাম সমূহ এবং কর্মকান্ড সৃষ্টিকুলের সত্তা, কর্মকান্ড, গুণাবলী এবং নামের মত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ »۔ (الشورى : ١١)

"তাঁর মত কোন কিছুই নয়।" (শুরা ঃ ১১)

তিনি আরো বলেন ঃ

« هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا »۔ (مريم : ٦٥)

"আপনি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জানেন।" (মরিয়ম ঃ ৬৫)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

«وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ»۔ (الاخلاص : ٤)

"কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই।" (ইখলাস ঃ ৪) অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।

২। মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অস্বীকার– যেমন হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা। যেমন এ বিশ্বাস করা যে, জান্নাত বা জাহান্নাম নেই অথবা জান্নাত বা জাহান্নাম হল রূপক অর্থে, বাস্তবে নেই।

৩। অস্বীকার করে কুফরী– তা হল কুরআন ও হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অথবা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করা কিম্বা রাসূল এর রিসালাতকে অস্বীকার করা।

শেষোক্ত বিভক্তকে 'কথা দ্বারা কুফরী' নামে সীমাবদ্ধ করা যায়।

ছোট কুফরীর প্রকারভেদঃ এটি কয়েক প্রকার।

১। নিয়ামতের কুফরী করা

এটি হল নিয়ামতকে অস্বীকার করা অথবা নিয়ামতকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো দিকে সম্পৃক্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ»۔ (النحل : ١١٢)

"দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনাপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।" (নাহল ঃ ১১২) তিনি আরো বলেন ঃ

«يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ»۔ (النحل : ٨٣)

"তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" (নাহল ঃ ৮৩) মুজাহিদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এটি হল মানুষের কথা– এটা আমার সম্পদ আমি আমার বাপদাদার কাছ থেকে ওয়ারিস সূত্রে পেয়েছি। আউন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, তারা বলেঃ ওমুক ব্যক্তি না থাকলে এটা হতনা। কতিপয় সালাফ বলেনঃ তারা এ ধরনের বলে- সুন্দর বাতাস ছিল আর মাঝি ছিল অভিজ্ঞ ইত্যাদি। যা সাধারণত অনেক লোকের মুখেই শুনা যায়। এর উদ্দেশ্য হল তারা এ সবকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করে অথচ একথা সবার জানা যে, আল্লাহর তাওফীক ছাড়া তা হতে পারত না। তারা একথা বলে না যে, আল্লাহরই একমাত্র প্রশংসা, তারা আল্লাহর দিকে নিয়ামতকে সম্পৃক্ত করে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ»۔ (النحل : ٥٣)

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে।" (নাহল ঃ ৫৩) তিনি আরো বলেন ঃ

«وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ»۔ (حم السجدة : ٥٠)

"বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা আমার যোগ্য প্রাপ্য।" (হামীম সিজদা ঃ ৫০)

মুজাহিদ এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এটা আমার কর্মের দরুন এবং আমিই এর প্রকৃত প্রাপক। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সে বলতে চায় এটা আমারই কৃতিত্ব। মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

«قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ»۔ (القصص : ٧٨)

"সে বলল, আমি এই ধন সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।" (কাসাস ঃ ৭৮)

কাতাদাহ বলেন ঃ উপার্জনের পথ জানার জন্য এবং অন্যান্যরা বলেন, আল্লাহ্‌ জানেন যে আমিই এর উপযুক্ত। মুজাহিদের এ কথার অর্থ-তা আমি পেয়েছি আমার সম্মানের কারণেই। সুতরাং সে আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত ও কল্যাণকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করে না। বরং তা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে এবং সম্মান মর্যাদার দিকে, ব্যবসায়ী চতুরতার দিকে ইত্যাদি। এজন্যই ধবলকুষ্ট ব্যাধিতে

আক্রান্ত এবং টাক মাথার অধিকারীদের আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকারের মত ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে নিয়ামত কেড়ে নেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

«لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ»- (ابراهيم : ٧)

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদের আরো বেশী দান করব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠিন ও কঠোর।" (ইব্রাহীম ঃ ৭)

যেমন সন্তানের নাম রাখা হল আবদুল হারেস। (হারেসের বান্দা) এবং আবদুর রাসূল (রাসূলের বান্দা) ইত্যাদি। কেননা সে আল্লাহর বান্দা না হয়ে অন্যের বান্দা হতে চায় অথচ তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর করুনা বর্ষণ করেছেন। মহান প্রভু বলেন ঃ

«فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا»- (الاعراف : ١٩٠)

"অতপর যখন তাদেরকে সুস্থ ও ভাল (সন্তান) দান করা হল তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগল।" (আরাফ ঃ ১৯০) অর্থাৎ নামে অংশীস্থাপন করল। নাম রাখল আবদুল হারেস। আর হারেস হল শয়তানের নাম।

২। নামায পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তা'য়ালার প্রকাশ্য বাণী -

«فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ

فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ»۔ (التوبة : ١١)

"অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" (তওবা ঃ ১১) এর বিপরীত হলো যারা তা করবে না, তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই নয়। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"اَلْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ"۔

"আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে অঙ্গীকার হল নামাযের। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে সে কুফরী করল।" জমহূরুল উলামা বলেন ঃ এটি ছোট শিরক। কতিপয় আলেম বলেন– এটি বড় কুফরী। তারা প্রমাণ হিসাবে বলেন যে, দলীলগুলি হল কুফরীর ব্যাপারে অনির্দিষ্ট, সুতরাং তা বড় কুফরীর দিকে ফিরে যায়। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর কারণে তা ছোট শিরক বলেই প্রতীয়মান হয়-

"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهَا لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهَا شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدُ أَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ"۔(رواه أبو داود)

"আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। সুতরাং যে এর কোন কিছুই বিনষ্ট করেনি এর হককে তুচ্ছজ্ঞান করেনি তার জন্য আল্লাহ্র নিকট অঙ্গীকার হল যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা পুরাপুরি আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আবু দাউদ)

এ ধরনের বিষয় বড় কুফরীতে হতে পারে না। এটি স্পষ্ট, তাই এ কুফরীর উপর হাদীসেই তাকে ধরা হবে।

৩। জ্যোতিষী ও গণকের নিকট আসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ اَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"۔(رواه أحمد)

"যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল তাহলে সে রাসূল (সঃ)এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল।" (আহমাদ) অপর হাদীসে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ اَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"۔(رواه أحمد)

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট আসল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল তাহলে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল।" (আবু দাউদ)

৪। স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ اَتَى حَائِضًا فِيْ دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ "۔(رواه أحمد)

"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর (হায়েজ অবস্থায়) গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করল সে মুহাম্মদ এর উপর নাযিলকৃত জিনিসকে অস্বীকার করল।" (আহমদ) এতো হল সে ব্যক্তির কথা যে, হায়েজের কারণে গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে, আর যে কোন কারণ ব্যতিরেকেই তথায় সঙ্গম করে তার কি হতে পারে ?

ছোট কুফরীর অনেক প্রকারভেদ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। যে সব কাজকে কুফরী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তা বড় কুফরী নয় এসবই ছোট কুফরী বলে গণ্য। ছোট কুফরীকে কর্মগত কুফরী বলা হয়ে থাকে এবং এবং বড় কুফরীকে বিশ্বাসগত

কুফরী বলা হয়ে থাকে।

একটি অবস্থা রয়েছে যে অবস্থায় বান্দার দ্বারা বড় কুফরী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও যা বড় কুফরী বলে গণ্য হবে না, তা হল ঃ

একঃ অনিচ্ছাকৃত ভাবে মুখ থেকে কুফরী কথা বের হয়ে গেলে। অথচ তার কুফরীর কোনই উদ্দেশ্য ছিলনা।

দুইঃ জ্ঞান বিলোপ অবস্থায়, ঘুমের কারণে, অচৈতন্য কিংবা মাতাল অবস্থায় কুফরী কথা বললে কাফের বলে গণ্য হবে না।

তিনঃ জবরদস্তিমূলক অবস্থায়। যেমন কাউকে হত্যা বা হুমকির ভয় দেখিয়ে কেউ মুখ দ্বারা কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা হলে- হত্যার বা এ ধরনের হুমকির ভয়ে। অথচ তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থাশীল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ»۔ (النحل : ١٠٦)

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত।" (সূরা নাহল ঃ ১০৬)

কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলে এবং বলে যে, আমি ঠাট্টা তামাশা করেছি তাহলে সে বাহ্যিক এবং গোপনীয় সব দিক দিয়েই কাফের। কেননা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করে কুফরী কথা বলা যাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

মুনাফিকী

সংজ্ঞাঃ মুনাফেকী শব্দের উৎপত্তি হল "নাফকাতুল ইয়াম্বু" হতে যার অর্থ গিরগিটির ফুঁ দেয়া। গিরগিটি যেমন তার রং পাল্টায় অর্থাৎ তার বাহ্যিক রূপ একরকম আর ভিতরটি অন্যরকম।

পরিভাষায় হলঃ 'বাহ্যিক ভাবে হক প্রকাশ করা তথা ইসলাম মানা এবং অন্তরে এর বিপরীত করা অর্থাৎ কুফরী পোষণ করা।' সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের সামনে প্রকাশ করে সত্য কাজ কিন্তু বিশ্বাসে ও কর্মে বাতিলকে লালন করে তাহলে সে মুনাফেক। তার বিশ্বাস ও কর্ম হল নিফাক।

মুনাকিকীর প্রকারভেদ-

মুনাফেকী দুই প্রকার ঃ

এক. বড় মুনাফেকী– তা হল আক্বীদাগত মুনাফেকী, যেমন মনে মনে কুফরী লালন করা এবং বাহ্যিক ভাবে ঈমান প্রকাশ করা।

দুই. ছোট মুনাফেকী ঃ

এটি হল কর্মগত বা আমল-ই মুনাফেকী। আমল এমন ভাবে প্রকাশ পায় যা শরীয়তের পরিপন্থী বলে গন্য হয়। এই দুই প্রকারের মাঝে পার্থক্য হল হুবহু বড় শিরক ও ছোট শিরকের মাঝের পার্থক্য গুলি সুতরাং সেগুলি দেখে নিলেই চলবে। কিন্তু মুনাফিকী কুফরীর

চেয়েও বেশী বিপজ্জনক। কেননা কুফরীর বিষয়টি প্রকাশ্য বুঝা সম্ভব কিন্তু মুনাফেকীর বিষয়টি সূক্ষ্ম ও গোপনীয়, সহজে বুঝা সম্ভব নয়। এজন্যই মুনাফেকরা মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের দ্বীনের জন্য কাফেরের চেয়েও বেশী বিপজ্জনক। আর এজন্যই মুনাফেকীর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে জাহান্নামের অতল গহবরে। যারা ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন, তারাই লক্ষ্য করবেন যে, মদীনায় মুনাফেকী প্রকাশ পেয়েছে। মক্কায় লোকজন ছিল দুই ভাগে বিভক্তঃ কাফের, মুশরেক এবং তাওহীদী মুসলমান। মুনাফেকী প্রকাশ পেয়েছে মুসলমানেরা রাষ্ট্র শক্তি পাবার পর। যারা রাসূলের সীরাত, খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস এবং এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ পাঠ করেছেন তারাই জানতে পেরেছেন যে উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে বিভিন্ন দলাদলি ও বিভক্তির পিছনে কারণ হল মুনাফেকরা। কাফের সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশ গুলিতে প্রবেশ করছে মুনাফেকদের সহযোগিতায়। মুনাফেকরা সর্বদা কাফেরদের সাথে, ঈমান এবং তাওহীদের বিপক্ষে। অধিকাংশ ফেরকার দলপতি ছিল মুনাফেক, যে সব ফেরকা মুসলিম উম্মাহর চরম ক্ষতি করেছে। এরা মুসলমানদের মাঝে কতিপয় মারাত্মক বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করেছে, তা হল-

১. ইসলামের ধারক, বাহক ও অগ্রগামী সাহাবীদের ব্যাপারে আস্থাহীনতার সৃষ্টি করা।

২. ইসলামের মূল উৎসের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি। কুরআন ও সুন্নাহ হতে মূলনীতি গ্রহণে সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করা।

৩. ইসলামের বিনাশ সাধনের প্রচেষ্টা।

৪. ইসলামের দলীল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা।

৫. মুসলমাদের মাঝে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টির চেষ্টা করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তৎপরবর্তী যুগে মুনাফেকদের বিপজ্জনকতা বেশী ছিল কিন্তু আমাদের সময়ে এর ব্যাপকতা আরো অনেক প্রকট আকার ধারন করেছে। কেননা সে সময় শুধুমাত্র মুনাফেকরা একাই বিরোধিতা করত কিন্তু আজ তাদের রয়েছে দেশী বিদেশী সবরকমের আশ্রয়, সাহায্য, সহযোগিতা। এজন্যই মুনাফেকদের সম্পর্কে, তাদের গুনাবলী ও আচরণ সম্পর্কে মুসলমানদের জানা অবশ্য কর্তব্য, যেন তাদের সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে এবং মুনাফেকদের পথ রুদ্ধ করতে পারে যেন তারা মুসলমানদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে না দিতে পারে।

আমাদের যুগে মুসলিম দেশগুলিতে কুফরী মতবাদ ছড়াতে বর্তমান মুনাফেকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যেমন জাতীয়তাবাদের ডাক, ধর্ম নিরপেক্ষতার ডাক। যেন এ ধরণের ডাক দিয়ে মুসলমানদের

ভিতর থেকে দ্বীনকে বিদায় করে দেয়া যায়। দ্বীনের কিছু প্রচলিত প্রথা ছাড়া আর কিছু বাকী না থাকে। তারা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হয়েছে। তন্মধ্যে মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ইসলামী নীতিকে তারা প্রশ্নসাপেক্ষ করে তুলেছে যেন রাষ্ট্রীয় ভাবে তা কখনো বাস্তবায়িত না হতে পারে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ছড়াচ্ছে। প্রতিটি ইসলামী বিধানকেই তারা টার্গেট করে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রেখেছেন তাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করার।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرَةً حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰه"-

“আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিয়ামত আসা অবধি।” এ কারণেই মুসলমাদের মনে সান্ত্বনা রাখতে হবে বাতিলের দাপট দেখে ধোকায় পড়া যাবেনা। বাতিল একবার সুযোগ পেলেও হকের সুযোগ রয়েছে অনেক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “একটি সহজতা দুইটি কাঠিন্যের উপর বিজয়ী।” এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য করুণা।

এ কারণেই আমাদের উপর অবশ্য করণীয় হল কুরআন ও

হাদীসের দিকে ফিরে আসা যেন মুনাফেকদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও তাদের গুণাবলী জানতে পারি। এরপর সে আলোকে তাদের প্রকৃতি আমরা বিচার করে দেখবো এবং সতর্ক হবো যেন শয়তানের রশিতে বাঁধা না পড়ি।

আক্বীদাগত মুনাফিকীর (বড়) প্রকারভেদ ছয় প্রকার-

এক. নবী করীম (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আংশিক বা পুরাপুরি।

দুই. নবী করীম (সা.) যা এনেছেন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তিন. রাসূল (সা.)কে ঘৃণা করা।

চার. রাসূল আনীত কিছু বিষয়কে ঘৃণা করা।

পাঁচ. রাসূল (সা.)-এর দ্বীনের সংকোচন হলে খুশী হওয়া।

ছয়. রাসূলের দ্বীনের বিজয় ও সম্প্রসারণকে ঘৃণা করা।

আমলগত মুনাফিকীর (ছোট) প্রকারভেদ পাঁচ প্রকার-

এক. কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى

الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا"۔

"মিথ্যা (ব্যক্তিকে) গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। আর গুনাহ্ নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে এমন হয়ে যায় যে, সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়।"

দুই. ওয়াদা খেলাফ করা।

তিন. আমানতের খিয়ানত করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"۔

"যে তোমার খিয়ানত করল, তুমি তার খিয়ানত করো না।"

চার. ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা এবং শিষ্টাচারের সীমারেখা অতিক্রম করা, প্রতিপক্ষকে মিথ্যার অপবাদ দেয়া এবং বিভিন্ন দোষে অভিযুক্ত করা।

পাঁচ. গাদ্দারী করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ".

"কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দারের জন্য ঝাণ্ডা গাড়া হবে। বলা হবে এটা ওমুকের গাদ্দারী।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে সব চিহ্নগুলিই একত্রিত হয়েছে ঃ

"آيَةُ الْمُنَافِقِ أَرْبَعَةٌ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ"۔

"মুনাফেকের আলামত চারটি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন ওয়াদা করবে তখন তা ভঙ্গ করবে, যখন ঝগড়া-বিবাদ করবে তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে এবং যখন কোন বিষয় চুক্তি বদ্ধ হবে তখন এতে গাদ্দারী করবে।"

আর একটি ধরনও রয়েছে তা হল ফজর এবং এশার জামায়াত ত্যাগ করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ"۔

"মুনাফেকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর নামায হল এশা এবং ফজরের নামায।" এখানে আরও একটি বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন যে ছোট মুনাফেকী বড় মুনাফেকীরই ভূমিকা স্বরূপ। এটি তার পথ সুতরাং যে ব্যক্তি এ পথে চলবে তার বড় মুনাফেকীতে চলে যাবার সমূহ আশংকা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ـ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ ـ (المنافقون : ١-٣)

"মুনাফেকরা আপনার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে। অতপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করেছে, তা খুবই মন্দ। এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।" (মুনাফেকুন ঃ ১-৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»ـ

(النساء : ١٤٥)

"নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে।" (নিসা ঃ ১৪৫)

আমরা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তাওহীদের (পরিপন্থী) কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তা সঠিকভাবে বুঝার তাওফীক দান করুন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়সমূহ থেকে নিস্কলুষ ও মুক্ত রাখুন। আমীন॥

সমাপ্ত

مطابع الحميضي
AL-HOMAIDHI PRESS - TEL. : 4581090 - FAX : 4582217

مسائل مهمة في التوحيد

(الشرك – الكفر – النفاق)

(باللغة البنغالية)

إعداد :

اللجنة العلمية بالدار

ترجمة :

محمد شمعون علي

مراجعة :

شيخ محسن علي

مسائل مهمة في التوحيد

إعداد :
القسم العلمي في يالدار

ترجمة :
محمد شمعون علي

ردمك ٩٩٦٠ ـ ٩٥٤٩ ـ ٤ ـ ٣

٥٩٢٢١٧ الرياض